মনসাসংস্কৃতি : লোকাচার ও প্রতিগ্রহণ (একটি আঞ্চলিক পর্যালোচনা)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে
পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

তনুশ্রী বিশ্বাস

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অনন্যা বড়ুয়া

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২২

মনসাসংস্কৃতি : লোকাচার ও প্রতিগ্রহণ (একটি আঞ্চলিক পর্যালোচনা)

মধ্যযুগের বিস্তৃত পরিসরে বহু কবির হাতে লেখা মনসামঙ্গল কাব্য যুগাতিক্রান্ত প্রভাব রেখেছে সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপ্ত ক্ষেত্রে। লোকসমাজে একদিকে দেবী মনসাকে কেন্দ্র করে পূজাপাঠ, লোকাচার, উৎসব, অপরদিকে মনসামঙ্গলের মূল কাহিনি অবলম্বনে মনসাযাত্রা, রয়ানী, যাতমঙ্গল, কবি ঝাঁপান, পটের গানের মত লোকসংস্কৃতির পৃথক পৃথক ধারা। আবার মার্জিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গীতিনাটক, চলচ্চিত্র, টেলি-ধারাবাহিক, বাংলা ব্যাণ্ডের গান, মেক আপ আর্টিস্টদের বিজ্ঞাপনের জন্য তৈরি মনসামঙ্গল ভিডিও - এই রকম বহুমুখী ধারায় মনসামঙ্গলের বিনির্মাণ চলছে। নির্বাচিত ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় প্রচলিত মনসাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ও অভিনয় শিল্পে মনসামঙ্গলের প্রতিগ্রহণের নানা ধারার পর্যালোচনা তথা বিশ্লেষণ করাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য। গবেষণাপত্রটি যেভাবে সাজিয়েছি, তার খসড়া নিম্নরূপ -

অধ্যায় বিভাজন –

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় - মনসাকেন্দ্রিক পূজা, উৎসব, লোকাচারের নানা দিক

দ্বিতীয় অধ্যায় - মনসাকেন্দ্রিক অভিকরণমূলক লোকসংস্কৃতি

তৃতীয় অধ্যায় - মনসামঙ্গল প্রভাবিত বাংলা নাটক

চতুর্থ অধ্যায় - বাংলা চলচ্চিত্রে মনসা কাহিনির প্রতিগ্রহণ

পঞ্চম অধ্যায় - বাংলা টেলি-ধারাবাহিকে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণ

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

পরিশিষ্ট - দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মনসার পালাগানের লেখ্যরূপ ও চিত্রসূচী

মনসাকেন্দ্রিক পূজা, উৎসব, লোকাচারের নানা দিক শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে মনসাসংস্কৃতির বিশিষ্ট দিকগুলিতে আলোকপাত করা হয়েছে, সেগুলি হল -

অরন্ধন

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে মনসা পূজা উপলক্ষ্যে অরন্ধন পালিত হতে দেখা যায়। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি বা ওই মাসের অন্য কোন দিন প্রচুর খাবার রান্না করে রাখা এবং পরের দিন সেই খাবার দিয়ে দেবী মনসাকে ভোগ নিবেদন করা হয়। পূজার দিন বাড়িতে কোন রকম আগুন জ্বালানো এবং রান্না করা নিষিদ্ধ থাকবে। এই প্রথাই অরন্ধন নামে পরিচিত। পূজার আগের দিন দুপুর থেকে শুরু হয় রান্নার প্রস্তুতি। স্নান করে গৃহস্থ সধবা নারীরা নতুন বা শুদ্ধ কাপড়, আলতা সিঁদুর পরে, শুরু করেন আয়োজন। রান্না শুরু হয় আগের দিন সূর্যাস্তের পর। উনুনের গায়ে আঁকা হয় স্বস্তিক চিহ্ন। পাশেই জ্বালানো হয় একটি মাটির প্রদীপ। রান্না চলাকালীন তো বটেই সারারাত ঐ প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রাখতে হয়। কোনও কোনও বাড়িতে বয়স্করা পড়েন মনসার পাঁচালী। রান্না শুরু করার আগে শাঁখ, কাসর, ঘণ্টা বাজানো হয় ও উলুধ্বনি দেওয়া হয়।

মনসামঙ্গলের দেবী একদিকে ক্রুর, নির্মম, হিংস্র, আবার অন্যদিকে তিনি মমতাময়ী, ভক্তবৎসল। সামান্য অনিয়মেই মা মনসা কুপিত হবেন। আবার তুষ্ট হলে তিনিই সংসার সন্তানদের আগলে রাখবেন। এই বিশ্বাসে শুদ্ধাচারে কঠোর নিয়ম রীতি মেনে যথাসাধ্য পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে পালিত হয় অরন্ধনের যাবতীয় লোকাচার।

হাওড়া, হুগলী জেলায় বংশ পরম্পরায় পালিত অরন্ধনের রান্না তিথিগত ভিন্নতায় বুড়ো রান্না, গাব্র বা গাবু রান্না, আঠাশে রান্না, বুধো রান্না, ইচ্ছা রান্না, ঢ্যালাপ্যালা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

অরন্ধনের রান্নায় কেবল নারীদের অধিকার। উগ্র পুরুষতন্ত্রের প্রতি মনসার তথা লোকসমাজে নারীর বিদ্বেষের পরিচয় বহন করে এ জাতীয় প্রথা। রান্না পূজার রান্নায় তাই ধনী গরীব তথা উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের খাবারের মিশেল দেখা যায়। ঠাণ্ডা খাবারগুলি চিত্তের বিনম্রতার আর রান্নার শেষে ভাতে ও উনুনে জল ঢালা, চাঁদের অহঙ্কারের আগুনে জল ঢেলে দেওয়ার প্রতীকী।

তাইতো পরের দিন আর গৃহে আগুন জ্বলে না। বেহুলার লড়াই ছিল বৈধব্যকে হারানোর , তাই অরন্ধনের রান্নার এই বিশিষ্ট লোকাচারে বিধবার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

রান্না পূজার খাবার খেতে গ্রামের কোনো মাঠ বা ফাঁকা জায়গায় সকলে মিলিত হবার প্রথা রয়েছে। যাদের বাড়িতে অরন্ধনের প্রচলন আছে, তারা তো বটেই যাদের প্রতিবেশী যে সকল পরিবারে এ রীতির প্রচলন নেই, তারাও একত্রিত হয়ে সকলের সঙ্গে খাওয়া দাওয়ায় সামিল হন। অরন্ধনে বাস্তুমাতা, সাপের দেবী, জেলে তথা লোকসমাজের রক্ষাকর্ত্রী রূপে মনসাপূজায় একদিকে মঙ্গলকাব্যের কাহিনি প্রভাব, অপরদিকে রান্না পদে মিশ্র সংস্কৃতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় । সর্বোপরি একবিংশ শতকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের যুগে এসেও প্রাচীন ঐতিহ্যকে বজায় রেখে মনসা পূজার পাশাপাশি বিপুল আয়োজন সহযোগে রান্না খাওয়াকে কেন্দ্র করে যে মিলন উৎসব উদযাপিত হয়, সৌহার্দ্য সমানুভূতির নিরিখে তা গভীর তাৎপর্যবাহী।

আলাবিয়া

রাজবংশী সমাজে প্রচলিত মনসা পূজা কেন্দ্রিক একটি বিশিষ্ট লোকাচার *আলাবিয়া* । উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা যে সব রাজবংশীরা উৎসবের এই ধারা বহন করে চলেছেন, তারা সকলেই পূর্ববঙ্গের ঢাকার আদি বাসিন্দা। সম্ভবত *আলাবিয়ার* সূত্রপাত ঢাকায়। ঢাকার মীরপুর, লবগঞ্জ, কুমারটুলি, সাবাড়, ফুলবেড়িয়া, কুঁদবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের রাজবংশীরা বংশ পরম্পরায় দেবী মনসার পূজা ও পূজা উপলক্ষে *আলাবিয়া* পালন করে থাকেন বলে জানা যায় ।

শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা পূজার সাত দিন আগে নারীরা বিজোড় সংখ্যক (তিন পাঁচ অথবা সাতটি) কচুপাতা পাশাপাশি রাখে। কচুপাতাগুলির ওপর রাখে এক তাল মাটি। প্রতিটি মাটির তালের ওপর ছড়িয়ে দেয় সোনা মুগের ডাল। সাতদিন পর মুগের ডালগুলি অঙ্কুরিত হলে সংক্রান্তির দিন আলাদা আলাদা সরায় মাটির তালগুলি তুলে নেওয়া হয় এবং সরাগুলি মনসা প্রতিমার সামনে সাজিয়ে রাখা হয়। অঙ্কুরিত চারাগাছগুলি আঞ্চলিক উপভাষায় জালি নামে প্রচলিত। *জালি* শব্দটি থেকেই কথ্য উচ্চারণে *জালা* এবং সেখান থেকেই ক্রমে *আলা* শব্দটি এসেছে। সরার সংখ্যা অনুযায়ী পাঁচ সাত বা তিনের আলা সম্পর্কে এক এক পরিবারে এক এক রীতি প্রচলিত। সরাগুলির মধ্যে দুটি ছোট সরা থাকে, এ দুটিকে *ব্যাঙের আলা* বলা হয়।

সম্ভবত সরার আকৃতির সাথে ব্যঙের চেহারার সাদৃশ্য থেকেই এরূপ নাম এসেছে। অঙ্কুরোদগমের এই প্রক্রিয়া রাজবংশীদের মধ্যে *আলা জাগানো* নামে পরিচিত।

মনসা পূজার দিন সন্ধ্যাবেলায় প্রতিবেশী বাড়ির দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে বর কনে সাজিয়ে উপস্থিত করা হয় দেবীর সামনে, সম্পন্ন হয় বিয়ের প্রতীকী অনুষ্ঠান। বিয়ের অনুষ্ঠানের লোকাচারে অঙ্কুরিত চারা গাছগুলি আবশ্যিক। এই অনুষ্ঠানই *আলাবিয়া* । *আলাবিয়ায়* ব্রাহ্মণ লাগে না। এটি সম্পূর্ণ নারী কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান।

আলাবিয়ার বীজ বপন, ও চারার অঙ্কুরোদগম একদিকে যেমন প্রজনন ও সন্তানের জন্মের প্রতীকী আবার বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য খাবারের ফলনেরও প্রতীকী।

এই উৎসবের উদযাপনে লোকসমাজে প্রতিফলিত হয় ভক্তি, নিষ্ঠা পারস্পরিক সহযোগিতা, সমানুভূতি তথা মনসা সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত এক সার্বিক কল্যাণ চেতনা। আবার *আলাবিয়ায়* সাত বার প্রদক্ষিণের পর বরের পা ছুঁয়ে বৌ এর প্রণাম, বৌএর হাতে বরের পা ধোয়ানো, বৌএর চুল দিয়ে বরের পা মোছানো, এই সব আচারে পুরুষতন্ত্রের উগ্র রূপ যুগ যুগ ধরে প্রবহমান। পাশাপাশি এই জাতীয় লোকাচারে শিশুমনে যে অসাম্যের শিক্ষা গেঁথে দেওয়া হয়, তা উৎসবের নেতিবাচক দিককে প্রতিপন্ন করে।

ভেলা ভাসানো উৎসব

ক্যানিং থানার অন্তর্গত বুধোখালি গ্রামে। আদিবাসী এবং বাগদি সম্প্রদায়ভুক্ত দেড়শ পরিবার এখানে বসবাস করেন। এদের সকলেই চাষের কাজ করেন, সকলেরই পদবী সর্দার। বিশ্বাসে সংস্কারে লোকাচারে এদের প্রধান আরাধ্য দেবী মনসা। প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে মনসার থান ও থানের পাশেই সিজমনসা গাছ। থানটি কেবল মাটির ছোট ছোট তিনটি ঢিপি। ওই ঢিপি তিনটিই দেবী মনসার প্রতিরূপ। পাশেই আরেকটি বড় ঢিপি রয়েছে। বড় ঢিপিটি মহাদেবের প্রতিরূপ। এভাবেই একেবারে সরল অনাড়ম্বর রূপে বুধোখালির প্রতি গৃহে দেবী মনসার অবস্থান। গৃহের সন্নিকটস্থ পুকুরে দুধকলা ও ফল দিয়ে প্রতি শনি মঙ্গলবার দেবী মনসার কাছে সংসারের কল্যাণ কামনা করে কলার ভেলা ভাসানো হয়। কিছু বছর আগে হঠাৎই এই এলাকায় সাপের প্রাদুর্ভাব বেড়ে গেলে গ্রামের কর্তা ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে মনসা পূজা করা এবং

স্থানীয় মাতলা নদীতে ভেলা ভাসাবার সিদ্ধান্ত নেন। নির্দিষ্ট দিনে ভাদ্র সংক্রান্তির মনসা পূজার আগেই বিপর্যয় প্রতিরোধে ২৯শে শ্রাবণ মনসা পূজা ও ভেলা ভাসানো হয়। তাই শ্রাবণ মাসের বুধোখালির এই পূজা অকাল বোধন মনসা পূজা নামে পরিচিত হয়। গ্রামের অধিবাসীদের কথায় অকাল বোধন মনসা পূজা ও ভেলাভাসানোর এই উৎসব পালিত হওয়ার পর আশ্চর্যজনকভাবে সাপের প্রাদুর্ভাব কমে যায়। তখন থেকেই প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে সাধ্যমত ঘটা করে বুধোখালির এই আদিবাসী সম্প্রদায় কর্তৃক সর্বজনীন মনসা পূজা ও ভেলাভাসানোর উৎসব পালিত হয়ে আসছে।

ভর : গ্রামীণ লোকবিশ্বাস ও ভেষজ চিকিৎসা - বুধোখালি গ্রামে বিখ্যাত প্রয়াত সুসাঙ্গিনী সর্দার। পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় উনি মনসার থানে *ভর* হতেন। স্থানীয় মানুষেরা বলেন, সুসাঙ্গিনী দেবী ভেষজ কিছু মূল্যবান ওষুধ জানতেন। সাপের কামড়ে আক্রান্তকে সুস্থ করতে তিনি যে গাছটি ব্যবহার করতেন, তার স্থানীয় নাম শিবজটা। অ্যান্টি ভেনাম সিরামের পাশাপাশি এই গাছটির যদি মানুষের শরীরে সাপের বিষমুক্ত করায় প্রকৃতই কোনও ভূমিকা থাকে, তাহলে তা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়।

ডায়মণ্ডহারবারের রায়চক গ্রাম বা পাথরপ্রতিমা ব্লকের দঃ রায়পুর ভেলা উৎসবের জন্য বিখ্যাত। দক্ষিণ রায়পুরের ৬এর ঘেরি, ৭এর ঘেরি, ৩এর ঘেরি, পিঁপড়েখালি, ১৩নম্বর, ১০এর ঘেরি, ১১র ঘেরি পাশাপাশি অবস্থিত সবগুলি গ্রামেই ভাদ্র মাসের শনি মঙ্গলবার সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় মনসা পূজা ও ভেলা ভাসানোর উৎসব। সাপে কামড়ের প্রাদুর্ভাব থেকে বাঁচতেই এই উৎসবের শুরু হয় সর্বত্র। স্থানীয় সুতারবাগ নদীতে ভেলা ভাসানো হয়। ভেলায় পূজার উপাচারের সামনেই দেওয়া হয় বিষাক্ত সাপগুলিকে। ক্যানিং এর বুধোখালির মতই গোসাবা, কুলতলি, পাথরপ্রতিমার সব গ্রামেই ভেলা ভাসানোর দিন অরন্ধন পালিত হয়। প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করে বেআইনি ভাবে বিষধর সাপদের আটকে তাদের নিয়ে নানাবিধ আচার আচরণ বিশেষত উগ্র উল্লাসে মেতে ওঠেন গ্রামবাসীরা।

নৌকা বাইচ - বেহুলার ভেসে চলার সূত্র ধরে যেমন ভেলা ভাসানো উৎসবের সূত্রপাত, তেমনই মনসা পূজার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। এই নৌকা বাইচের সময় মাঝি মাল্লারা সমবেত কণ্ঠে সারি গান গায়। নৌকার মধ্যে ঢোল তবলা নিয়ে গায়েনরা গানে

গানে উৎসাহ দেন মাঝিদের। নৌকা বাইচের সূত্রপাত যেহেতু মনসা পূজা তথা মনসামঙ্গলের কাহিনির অনুষঙ্গে ঘটেছিল, তাই এর সঙ্গে যুক্ত লোকগানগুলিও পরোক্ষ ভাবে মনসা সংস্কৃতির ফসল -

কোন মিস্তিরি নাও বানাইলো এমন দ্যাখা যায়

ঝিল মিল ঝিল মিল করে রে ময়ূরপঙ্খী নায়

চন্দ্র সূর্য বান্ধা আছে নাওয়েরই আগায়

দূরবীনে দেখিয়া পথ মাঝি মাল্লায় গায়

ঝিল মিল ঝিল মিল করে রে ময়ূরপঙ্খী নায়

... ...

[শাহ আব্দুল করিম]

মনসাদ্বীপের মনসা পূজা ও নাগমেলা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরের কূলবর্তী প্রায় তিনশ বর্গকিলোমিটার বেষ্টিত সাগর দ্বীপ। মোট ৪৩ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত এই দ্বীপে গঙ্গাসাগর মেলার পরেই আরেকটি অতি বিখ্যাত মেলা হল মনসা দ্বীপের নাগ মেলা।

মনসা দ্বীপের পূজার ইতিহাস - ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে মনসাদ্বীপের প্রথম মনসা পূজার প্রচলন হয়, উত্তর পূর্ব মনসা পাড়ার পুরুষোত্তমপুরে প্রতিষ্ঠিত মনসা মন্দিরে। পরবর্তীকালে ১৯৮০ সালে হঠাৎই মনসাদ্বীপে সাপের কামড়ের উপদ্রব অত্যন্ত বেড়ে যায়। ফলে প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়। তৎকালীন মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ সিদ্ধিতানন্দজী এই অঞ্চলে নাগ তথা মনসা পূজার পরামর্শ দেন। ডাক্তার শিবেন্দু রায়, যিনি চিকিৎসা করে এই সময় অনেক সাপে কাটা রুগী ভালো করেছিলেন, তিনিও মহারাজের পরামর্শে সহমত হন। সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমি সংরক্ষন বিভাগে চাকুরিজীবী সীতানাথ মাইতি, স্থানীয় ধর্মপ্রাণ অবন্তি মান্না নাগ ও মনসা পূজার প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের শিক্ষক পণ্ডিত দিবাকর পানিগ্রাহী তখন ওড়িশা গিয়ে সেখানকার মোহান্তদের কাছ থেকে নাগ পূজা

পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে আনেন। এবং সেই রীতি মেনেই মনসাদ্বীপে স্থানীয় পুরোহিতদের দ্বারা নাগরাজ বাসুকি ও মনসামাতার পূজা শুরু হয়। আশ্চর্যজনকভাবে প্রথম বছর পূজা হওয়ার পর থেকেই এই অঞ্চলে সাপের কামড়ের উপদ্রব বহুলাংশে কমে যায় বলে জানান প্রবীণ গ্রামবাসীরা।

স্থানীয় সম্পন্ন ব্যাক্তি ও প্রশাসনিক সাহায্যে দিনে দিনে বাড়তে থাকে পূজার প্রসার। অষ্টনাগ নাগিনী সহ বাসুকি ও মনসা মাতার পূজার সঙ্গে যুক্ত হয় গঙ্গামাতা, গণপতি, সাগরেশ্বর মহাদেব জীউ, যোগমায়া দেবী, বিশালাক্ষী মাতার ষোড়শোপচারে পূজা এবং সত্যনারায়ণের পূজা ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান। জন মনোরঞ্জনে পূজার সঙ্গে যুক্ত হয় মেলা, যা নাগমেলা নামে প্রচলিত। অত্যাধুনিক আলোকসজ্জা, নাগরদোলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যাত্রানুষ্ঠান। সরকারি উদ্যোগে নাগমেলা প্রাঙ্গন সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যায়নের কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে। এই নাগ ও মনসা পূজার প্রসার যেভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে তাও বিস্ময়কর। দেশ বিদেশ থেকে নাগমেলা প্রাঙ্গনে লক্ষাধিক লোক সমবেত হয়। পূজা ও মেলা প্রাঙ্গন আগত ভক্তের পক্ষে একেবারে অকুলান হয়ে পড়ে।

পূজা পদ্ধতি - প্রতি বছর নভেম্বর মাসে সপ্তাহকাল ব্যাপী এই পূজা ও মেলার আয়োজন হয়। প্রথম দিন পুণ্য তীর্থ গঙ্গাসাগর থেকে শোভাযাত্রা সহকারে *ঘট উত্তোলন* পর্ব সম্পন্ন হয়। গঙ্গাসাগরে পৌঁছে মা গঙ্গার আরাধনা হয়। তারপর মনসামাতার আবাহন সম্পূর্ণ হলে পুনরায় বাদ্য সহযোগে জলপূর্ণ কলস নিয়ে ফেরা হয় শোভাযাত্রা সহকারে। পূজা মন্দিরে জলভরা কলস দুটি প্রতিষ্ঠা করে *ঘট উত্তোলন* অনুষ্ঠান সমাপন হয়।

পরের দিন থেকে পর পর একে একে হয় ষোড়শোপচারে শাস্ত্রীয় বিধি বিধান অনুযায়ী গনেশ, গঙ্গামাতা, সাগরেশ্বর মহাদেব জীউ, বিষ্ণুদেব, যোগমায়া, অষ্টনাগ বাসুকি ও মনসা পূজা এবং শেষ দিন সত্যনারায়ণ পূজা এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান। মনসা পূজার দিন এখানে আসেন মূলত মনসাদ্বীপের এবং পাশাপাশি গ্রামের নারীরা। এ দিন পঁচিশজন পুরোহিত সকাল দশটা থেকে বেলা চারটে পর্যন্ত শাস্ত্রীয় বিধি বিধান অনুযায়ী পূজা সম্পূর্ণ করেন। এখানের মনসা জাগ্রত দেবী বলে লোকবিশ্বাস। এই বিশ্বাস থেকেই অসংখ্য মানুষ মায়ের কাছে বিভিন্ন মানত করেন।

মনোবাঞ্ছা পূরণের পর ভক্তিভরে এরা মাকে পূজা দিতে আসেন। মেলা প্রাঙ্গণে মনসা-পালাগানের আয়োজন হয়।

মনসাদ্বীপের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ধবলাটের মনসা পূজাটি সত্তর বছরেরও পুরনো বলে জানা যায়। প্রাথমিক ভাবে একটি গাছের নীচে ঝুপড়িতে এই পূজার সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীকালে মায়ের স্থায়ী মন্দিরটি গড়ে ওঠে। এই মন্দিরে স্থাপিত মনসা দেবীর প্রতিমার মাথার পেছনে মূর্তি আকারে রয়েছে পঞ্চমুণ্ড সাপের ছত্রছায়া। মনসা মন্দিরের একেবারে কাছেই প্রকৃতির তাণ্ডবে বঙ্গোপসাগরে গ্রাসে তলিয়ে যাওয়া ভূমিরূপ। আয়লা ঝড়ের পরে এই বিপর্যয়ের চূড়ান্ত ছবি এখানে পরিস্ফুট। গাছের তলায় দেবীর প্রতীকী একটি ছোট পঞ্চমুণ্ড সাপের মূর্তি রয়েছে, যেখানে গ্রামের মানুষেরা ভক্তিভরে প্রণত হন। প্রতি বছর রাস পূর্ণিমায় দেবী মনসার বিশাল ঘটা করে পূজার আয়োজন করা হয়। সঙ্গে পালন হয় রাধা কৃষ্ণের রাস উৎসব। মনসা পূজা উপলক্ষ্যে এক সপ্তাহ ব্যাপী এক জাঁক জমক পূর্ণ মনসামেলার আয়োজন করা হয়। বিধ্বস্ত প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে থেকেও সমুদ্র তীরবর্তী ধবলাটের লোকসমাজে দেবী মনসার প্রতি বিশ্বাস, আস্থা, ও নির্ভরতার এক বাস্তব চেহারা পরিলক্ষিত হয়।

সামতা গ্রামের মনসা পূজা

সামতা গ্রামের একেবারে পূর্ব প্রান্তে বিশালাকার অশ্বত্থ, নিম গাছের মাঝখানে সিজ মনসা গাছে পৌষসংক্রান্তিতে ধুমধাম করে মনসা পূজা হয়। গ্রামের প্রাচীনদের মতে এ পূজা প্রায় তিনশো বছর ধরে হয়ে আসছে। কোনো প্রতিমা নেই, সিজ মনসা গাছেই এই পূজা চলে আসছে। কথিত আছে অশ্বত্থ, নিম আর সিজ মনসা গাছের একত্রে জন্মানোর বিষয়টি অলৌকিক। কামাক্ষা থেকে আগত কোনো এক সাধু নাকি মন্ত্র বলে গ্রামে এই গাছগুলি স্থাপন করে। একটি বালক খেলতে খেলতে একদিন দেবী মনসার দর্শন পান, এবং সেই প্রথম গাছগুলির সামনে বসে মনসা পূজা শুরু করে। সেখান থেকেই গ্রামে মনসা পূজার প্রথম সূত্রপাত। পৌষ সংক্রান্তিতে সে দেবী দর্শন পেয়েছিল, তাই প্রতি বছর ঐ তিথিতেই গ্রামের সকলে মিলে পূজার আয়োজন করে।

প্রচলিত লোকবিশ্বাস ও মিথ - প্রচলিত ছোট ছোট গাছগুলি বৃহদাকার হলে উঁচু করে বাঁধিয়ে দেওয়া হয় মনসার থান। এ গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই তুলসি ও সিজ মনসার গাছ পূজিত হয়।

সামতার পৌষ সংক্রান্তির মনসা থানের পূজায় ডাকাবেরিয়া, আষাঢ়িয়া ইত্যাদি প্রতিবেশী গ্রাম থেকে বহু মানুষ একত্রিত হয়। মনসার এই থানের পাশেই গ্রামের বাসিন্দা মেডিকেল কলেজের ডাক্তার চন্দ্রশেখর মহাপাত্র গ্রামের মানুষের পানীয় জলের সমস্যা দূর করতে একটি পুকুর খনন করিয়েছিলেন। এই পুকুরটি মনসা-পুকুর নামে পরিচিত হয়। গ্রামের যে কোনো সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই মনসা-পুকুরের জল ব্যবহৃত হয়। সামতা গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই সিজ গাছে মনসা পূজার প্রচলন আছে। সামতার মত প্রত্যন্ত গ্রামে উঁচু বেদী বা থানে শত শত বছর ধরে চলে আসা মনসা পূজা লোকজীবনের অনাড়ম্বর গভীর ধর্ম বিশ্বাসকে তুলে ধরে।

মানশ্রী গ্রামের ঈশানকুমারী পূজা

মহাদেবের এক নাম ঈশান, তার কন্যা মনসা তাই ঈশানকুমারী। হাওড়া জেলার উদয়নারায়নপুর ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ মানশ্রী গ্রামে ঈশানকুমারী নামে দেবী মনসা বহু প্রাচীন কাল থেকে পূজিত হয়ে আসছেন। শতাব্দী প্রাচীন একটি সুবিশাল বটবৃক্ষের নীচে একটি অনুচ্চ থানে দেবীর পূজার প্রচলন ছিল। কিছু বছর আগে থেকে পূজার সঙ্গে মেলার প্রচলন হয়, এবং একটি ছোট্ট মন্দিরও নির্মাণ হয়। মন্দির গাত্রে খোদিত আছে *ওঁ মা ঈশান কুমারী আনন্দ মেলা, নির্মাণ কল্পে গোবর্ধন মাল, ১৪০১ বঙ্গাব্দ*। আবার অন্যত্র খোদিত তথ্য অনুযায়ী ১৪১১ বঙ্গাব্দের ২রা চৈত্র বিশাল বট গাছের নীচে ছোট্ট বেদী তথা মন্দির নির্মিত হয়। অর্থাৎ মেলার প্রচার ও মন্দির নির্মাণ কিছু বছর আগে হয়েছে কিন্তু থানে ঈশানকুমারীর পূজার প্রচলন বহু প্রাচীন।

ঈশানকুমারী পূজার বিশেষত্ব - প্রতিদিনের নিত্যপূজার পাশাপাশি প্রতি বছর ৭ই চৈত্র মানশ্রী গ্রামে ঈশানকুমারীর বাৎসরিক পূজা সাড়ম্বরে পালিত হয়। পূজা উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন জায়গায় দু'দিনের জন্য মেলা বসে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ সমবেত হয় পূজাপ্রাঙ্গনে। মানস পূরণে পাঁঠাবলি হয়। ৮ই চৈত্র অন্নকূট উৎসবে মায়ের ভোগ বিতরণ করা হয়। প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ এই উৎসবে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করেন।

যে কোনো সামাজিক কর্মে দেবীর পূজা বাধ্যতামূলক ভাবে প্রচলিত। শুধু দক্ষিণ মানশ্রী নয়, পাশাপাশি অবস্থিত গ্রামগুলির মানুষের মধ্যেও ঈশানকুমারীর প্রতি ভক্তি বিশ্বাস সমানভাবে

রয়েছে, তারাও বাৎসরিক পূজা ছাড়াও নিজেদের পারিবারিক কল্যাণ কামনায় দেবীর কাছে আসেন। মানস পূরণে শনি বা মঙ্গলবার পাঁঠা বলি দেন।

লোকবিশ্বাস - যে বিশাল বটবৃক্ষের নীচে এই থানটি নির্মিত, কেউ সেই গাছের ডাল ভাঙলে তার বড় কোনো ক্ষতি হবেই, এমনই মিথ এখানে প্রচলিত। এমন ক্ষতির সাক্ষী রয়েছেন বহু মানুষ। বট গাছটি চারপাশে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে যুগ যুগ ধরে যাদের জমির ওপর এই গাছ বিস্তৃত হচ্ছে, তারা সশ্রদ্ধ মনে তাদের জমি ছেড়ে দিচ্ছেন ঈশানকুমারীর নামে।

ঈশানকুমারীকে খুব জাগ্রত দেবী বলে বিশ্বাস করেন গ্রামের মানুষ। এই গ্রামে কোনো অনাচার করে কেউ দেবীর কোপ থেকে রেহাই পান না, বরং কঠোর শাস্তি পেতে হয় - এরকম উদাহরণ গ্রামের সকলেরই জানা। তাই ঈশানকুমারী মনসার এক প্রচ্ছন্ন চেতনা এই অঞ্চলের মানুষের ধর্ম অধর্ম, ন্যায় নীতি বোধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

দেবীর মাহাত্ম্য গ্রামবাসীদের কাছে জীবন্ত হলেও সাপের কামড়ে ওঝা বা ঝাড় ফুঁকের অবৈজ্ঞানিক সংস্কার এদের মধ্যে নেই। স্থানীয় গাববেড়িয়া হাসপাতালেই আক্রান্তের চিকিৎসা করানো হয়।

বর্ধমানের ঝাঁকলাই পূজা

বাংলায় প্রচলিত সাপের দেবী মনসা। তবে জীবন্ত সাপকে দেবী মনসা জ্ঞানে পূজা করার রীতি সেভাবে প্রচলিত নয়। বর্ধমান জেলার কিছু গ্রামে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসাবে জীবন্ত সাপ পূজা হয়ে আসছে প্রায় চারশো বছর ধরে। মঙ্গলকোট থানার মুসারু, ছোটপোষলা, বড়পোষলা, পোলসোনা, নিগণ, শিকড়তো, মইদান - এই গ্রামগুলির জনপ্রিয় আঞ্চলিক দেবী ঝঙ্কেশ্বরী বা ঝাঁকলাই।

ঝংকেশ্বরীর পূজার উদ্ভব ও প্রসার - ঝঙ্কেশ্বরী বা গ্রামবাসীদের মুখে প্রচলিত ঝাঁকলাই কেউটে প্রজাতির একটি বিশেষ সাপ, যাকে দেবী কল্পনায় পূজা করা হয়। মুসারু, ছোটপোষলার ঝাঁকলাই মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত শ্যামলকুমার চক্রবর্তী ও গ্রামবাসীদের কথা অনুযায়ী ঝাঁকলাই এর প্রথম দেখা পাওয়া গেছিল ৪০০ বছর আগে। নয়শো এগারো সালে আষাঢ় মাসে স্বপ্নাদেশ পেয়ে মুরলীমোহন চক্রবর্তী দেবী ঝঙ্কেশ্বরীর পূজা প্রতিষ্ঠা করেন।

ঝাঁকলাই পূজার বিশেষত্ব - আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে প্রতি বছর ঘটা করে ঝঙ্কেশ্বরীর পূজা হয়। মানস পূরণে পাঁঠাবলি হয়। এই পাঁঠাবলি মনসা পূজার সঙ্গেও নানা স্থানে প্রচলিত। পূজার আগের দিন তেল হলুদ দিয়ে দেবীর গাত্র মার্জন করা হয়। পূজার দিন সকালে সেবায়েত পরিবার দ্বারা পূজা হওয়ার পর, বীরভূম জেলার শ্রীকৃষ্ণপুরের জমিদারদের পক্ষ থেকে পূজা উৎসর্গ করা হয়, তারপর এলাকার উগ্রক্ষত্রিয় সাঁই মল্ল কুণ্ডু পরিবারের পূজা উৎসর্গ করা হয়। সব শেষে সর্বসাধারণের পূজা।

এছাড়া এই পূজার বিশেষ উপাচার হিসাবে নাগকলস বা ক্ষীরকলস যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। চারটি গ্রামের মন্দির থেকে একটি কলসিতে ক্ষীর, দই, ও দেবীকে নিবেদন করা সামগ্রী রেখে নতুন গামছায় কলসির মুখ বেঁধে, চাঁদমালা রজনীগন্ধা, বেলফুলে কলসি সাজিয়ে, একজন ঢাকি সহ একজন ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। সিংহাসনে উপবিষ্ট ঝঙ্কেশ্বরীকে গাড়িতে তুলে দেবীকে নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোয়। পাশাপাশি গ্রামগুলি থেকেও দেবীমূর্তি নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হলে পুনরায় একসাথে চলে দেবীর পূজা। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি রোয়াপূজা নামে পরিচিত।

লোকবিশ্বাস - উল্লিখিত গ্রামগুলির শোবার ঘরে, রান্না ঘরে, বাড়ির উঠোনে, মন্দিরে কেউটের সমগোত্রীয় ঝাঁকলাই নামে পরিচিত সাপগুলি যত্র তত্র দেখা যায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে সাপটি অত্যন্ত বিষাক্ত তবে একটু নিস্তেজ প্রকৃতির, সচরাচর কামড়ায় না। গ্রামবাসীরা বলেন এই সাপ তাদের কোনো ক্ষতি করে না, উপরন্তু এই সাপের জন্য গ্রামে অন্য কোনো সাপের উপদ্রব নেই। এরা ঝাঁকলাই এর কামড়কে দেবীর প্রসাদ বলে মনে করেন। ঝঙ্কেশ্বরীর মন্দিরগুলির বর্তমান পুরোহিত শ্যামলকুমার চক্রবর্তী বলেন তিনি সারা জীবনে প্রায় দু'হাজার সাপে (ঝাঁকলাই) কামড়ানো মানুষকে সুস্থ হতে দেখেছেন। যেখানে আক্রান্ত ব্যক্তিকে উপবাসে রেখে, গ্রামের পুকুর থেকে স্নান করিয়ে মায়ের মন্দিরে আনার পর, দু'একদিনের মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যায়। তবে এই ঝাঁকলাইএর মারণ বিষ থাকা সত্ত্বেও এতদ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কেউটে প্রজাতির এই সাপের দীর্ঘ সহাবস্থান, তার কামড়ে মৃত্যু না হওয়ার ঘটনা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে।

ঝাঁকলাই পূজার বিপন্নতা ও ধর্মীয় বিদ্বেষ - দেবীর পূজার স্বত্ব কেবল মুসারুর চক্রবর্তী পরিবারেরই রয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী। ভবিষ্যতে পূজার দায়িত্ব নেওয়ার অভাব হলে, কীভাবে পূজা চালানো সম্ভব হবে, সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন মন্দিরগুলির বর্তমান সেবায়েত শ্যামলবাবু। ইতিপূর্বে নিকটস্থ সাতটি গ্রামে ঝঙ্কেশ্বরীর দেখা পাওয়া যেত, কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষ মনে করেন মুসলিমদের অনাচারেই দেবী এখন কেবলমাত্র চারটি গ্রামেই অবস্থান করেন। দেবীকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বিদ্বেষ এখানে স্পষ্ট।

মনসা লোকসমাজেই অধিকতর পূজিতা, আর ঝঙ্কেশ্বরী ব্রাহ্মণের অধিকৃত দেবী। দুই দেবীর আরাধনার ধ্যানমন্ত্রও আলাদা। মনসা পূজায় ধূপ ধুনোর ব্যবহার নেই, কিন্তু ঝঙ্কেশ্বরীর পূজায় ধূপ ধুনো ব্যবহৃত হয়।দেবী ঝঙ্কেশ্বরী প্রচার বিমুখ, তিনি কয়েকটি ছোট্ট গ্রামের মধ্যেই আবদ্ধ। গ্রামগুলির বাইরে তাদের দেবীর প্রচার নিষিদ্ধ। বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় মনসাপূজার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ঝাঁপান গান, অন্যদিকে মুসারু, ছোটপোষলা, বড়পোষলা, পোলসোনা গ্রামে বেদের প্রবেশ তথা ঝাঁপান গান নিষিদ্ধ। পাশাপাশি আলোচনায় একদিকে মনসা ও ঝঙ্কেশ্বরী সর্প সংস্কৃতির অঙ্গীভূত দুই দেবীর নিজেদের অবস্থানগত বৈপরীত্য উঠে আসে এবং সেই সাথে এদের কেন্দ্র করে সামাজিক বর্ণবৈষম্যের সংকীর্ণ চেহারাও প্রত্যক্ষ হয়।

ওয়াদিপুর ও নারকেলডাঙায় দুর্গা ও মনসার সম্মিলিত রূপের পূজা

মন্দিরের ইতিহাস ও পূজা পরিচয় - ওয়াদিপুরের মনসামাতার মন্দিরটি প্রায় তিনশো বছরের প্রাচীন। মন্দিরগাত্রে যে প্রতিষ্ঠা সাল উল্লিখিত তা ১১৪৫ সন, ৪ঠা বৈশাখ। এই মন্দিরে মনসামাতার প্রতিমার দুদিকে রয়েছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, বেহুলা ও লক্ষিন্দরের প্রতিমা। মনসার সঙ্গে বেহুলা লক্ষিন্দর অনেক জায়গায় পূজা পান, কিন্তু লক্ষ্মী, সরস্বতীর অবস্থানের বিষয়টি একেবারে অনন্য।

এখানে মূল পূজা হয় দশহরা, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ও শারদ অষ্টমীতে। এছাড়া ভাদ্র সংক্রান্তিতে অরন্ধন ও মনসা পূজা হয়। পূজা উপলক্ষ্যে বহু লোকের সমাগম হয় ওয়াদিপুরের মনসামাতার মন্দির প্রাঙ্গনে। মনসা পূজায় দেবীকে ক্ষীর ভোগ নিবেদন করা হয়, দণ্ডীকাটা হয়। মনসামন্দিরে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীও উদযাপন করা হয়। এ গ্রামে মনসা পূজা উপলক্ষ্যে

অরন্ধনের রান্নায় কেবল আলু ছাড়া আর কোন সব্জি ব্যবহৃত হয় না। প্রতি মাসের সংক্রান্তিতেই চিড়ে, মুড়কি পাঁচ রকমের ফল দিয়ে গ্রামের নারীরা দেবীকে পূজা করেন।

প্রতিমায় ও উদযাপনে দুর্গা ও মনসার অভেদ কল্পনা - দুর্গাপূজার অষ্টমীতে মনসামন্দিরে চলে চণ্ডীপাঠ। মনসাও তো দুর্গার শক্তির আর এক প্রকাশ। তাই মনসামন্দিরেই চলে দুর্গোৎসব। এই ভাবনা থেকেই মনসার সঙ্গে থাকেন লক্ষ্মী সরস্বতী। অষ্টমীতে চলে পাঁঠাবলি, থালায় সাজিয়ে রক্তাক্ত ছাগমুণ্ড নিবেদন করা হয়, মনসার সামনে। তার পর চলে আখ, আনারস, কলা, চালকুমড়ো, লেবু এগুলির এক এক করে বলি।

চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে পাড়ার প্রায় ২০০ জন সন্ন্যাস রীতি পালন করেন। পুরো চৈত্র মাস খাবার, পোশাক, আচরণে সংযম পালন করার পর ঝাঁপ ইত্যাদি কঠিন রীতি পালন করতে হয়। শেষে মনসা মন্দিরের সামনে এসে সন্ন্যাসীরা ভাবে বিভোর হয়ে নাচতে থাকে । এদের বিশ্বাস মনসা মায়ের হাতের আশীর্বাদী ফুল ঝরে পড়লে তবেই সন্ন্যাস সফল হয়। বাঁকুড়ার অযোধ্যা গ্রামের দশহরা উৎসবের ভোক্তা নাচ ও ফুল কাড়ানোর সঙ্গে এর মিল রয়েছে।

দোলের আগের দিন ওয়াদিপুরে চাঁচর উৎসব হয়। ঢাক, ঢোল বাজিয়ে মহা সমারোহে শুকনো পাতার ঘর পোড়ানো হয়। এই উৎসবের সঙ্গে বিশেষভাবে মনসা পূজা যুক্ত হওয়া ওয়াদিপুরের বিশেষত্ব।

গ্রামে রয়েছে মনসা, শীতলা, শিব, মাকাল (দুর্গা) ও চণ্ডীর মোট পাঁচটি মন্দির, তবে মনসাই গ্রামের প্রধান দেবী। তাই যেকোনো দেব দেবীর বিশেষ পূজায় মনসা পূজা করা এ গ্রামে বাধ্যতামূলক।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় - ওয়াদিপুরের মানুষের চেতনায় তাই দেবী চণ্ডী আর মনসা মহাশক্তির নিরিখে অভিন্ন হয়ে গেছে। বর্ধমানের কালনা থানার অন্তর্গত নারকেলডাঙার জগৎগৌরী দেবীর মধ্যেও মনসা ও দুর্গার সম্মিলিত রূপের প্রকাশ দেখা যায়। ওয়াদিপুরে মনসার সঙ্গে বেহুলা লক্ষিন্দর ও লক্ষ্মী সরস্বতী মূর্তি রয়েছে আর কালনার নারকেলডাঙায় সিংহের পিঠে পদ্মাসনা দেবীর মনসার বাম কোলে শিশু আস্তিক, আবার মাথায় অষ্টনাগ মূর্তি

দেখা যায়। ওয়াদিপুরে যেমন দুর্গাষ্টমীতে মনসার সামনে চণ্ডী পাঠ হয়, নারকেলডাঙায় তেমনি দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও মনসার ত্রিস্তরীয় ধ্যানমন্ত্র পাঠ হয়।

গ্রাম পরিক্রমা, চলন্ত নাচঘর ও *থাকা* - নারকেলডাঙায় দশহরা ও নাগপঞ্চমীতে দেবীর বাৎসরিক পূজা হয়। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে সোম বা শুক্রবার থেকে শুরু হয় দেবীর গ্রাম পরিক্রমা। ৩২টি গ্রামে তিথি অনুযায়ী দেবী অবস্থান করবেন। নাগপঞ্চমীর দু'দিন আগে দেবী ফিরে আসেন নারকেলডাঙার মূল মন্দিরে। গরুর গাড়িতে গাছ, কাপড় দিয়ে ঘর তৈরি করে নাচ গান করা হয় । গ্রাম থেকে গ্রামে চলে এই চলমান নাচ গানের অনুষ্ঠান। এছাড়া বড় ট্রাক্টরে মন্দির বানিয়ে ধাপে ধাপে পুতুল সাজিয়ে রামায়ণ মহাভারতের নানা পৌরাণিক আখ্যান তুলে ধরা হয়, একে *থাকা* বলে। চলন্ত মন্দিরের সাথে থাকে বাজনা সহযোগে শোভাযাত্রা।

নারকেলডাঙার জগতগৌরী উৎসবে ঝাঁপানতলায় ১০০০টি ও মূলমন্দিরে ২৫০০টি পাঁঠাবলি হয়। এছাড়া সারা বছর শনি মঙ্গলবার বলির প্রচলন রয়েছে। মল্লভূম বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব শাসকদের প্রভাবে বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহুযুগ আগে থেকে বলি নিষিদ্ধ হয়েছে অথচ পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে নারকেলডাঙায় ধর্মের নামে এই নির্মম প্রথা ভয়ঙ্করভাবে চলছে।

মুসলমান ধর্মের মানুষও সাপের হাত থেকে বাঁচতে এই মন্দির থেকে ফুল নিয়ে যায়, এবং যেখানে আল্লাহ'র উপাসনা করে সেখানে নিয়ে যায়। সাপের ভয় এখানে ধর্মের মেলবন্ধন ঘটায়।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে চণ্ডী মনসার অভেদ ভাবনা - পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতের নানা রাজ্যে বিখ্যাত মনসামন্দিরে মনসাকে মহাশক্তির প্রকাশ রূপেই দেখা হয়। উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, বা অন্ধ্রপ্রদেশের উল্লিখিত মনসামন্দিরগুলিতেও নবরাত্রিতেই মনসার বাৎসরিক পূজা উদযাপিত হয়। সুতরাং মহাশক্তিরূপিণী দেবীকে দুর্গা, অম্বা, কালি, যে নামেই আমরা চিহ্নিত করি না কেন, তার সঙ্গে মনসার একাত্মতার তত্ত্ব শুধু বাংলার নয়, ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত।

বাংলার যেসব মন্দিরে দুর্গার সঙ্গে মনসাকে সমন্বিত করা হচ্ছে তাদের আদি সেবায়েত ব্রাহ্মণ। সম্ভবত সামাজিক কারণ এবং সাপের ভয়, দুটি কারণেই মনসা পূজা যখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে,

তখন আদিবাসী তথা নিম্নবর্ণের মানুষের পূজিতা দেবীকে আরাধনা করায় ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণীয়ের কৌলীণ্যে বাঁধা হয়। সহজ উপায় হিসাবে লৌকিক আর পৌরাণিক দেবীর অভিন্নতা প্রচার করা হয়। মনসাই যদি দুর্গা বা জগদ্ধাত্রী হন, তাহলে ব্রাহ্মণের পক্ষে তার আভিজাত্য তথা বংশকৌলীণ্য বজায় রেখে মনসা পূজা করতে আর কোনো অসুবিধা হয়না।

কমলা, বিমলা ও বেহুলার পূজা

আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসের নাগপঞ্চমী তিথিতে বর্ধমানের কালনা ব্লকের অন্তর্গত নেপাকুলি গ্রামে মনসার বাৎসরিক পূজা হয়। গ্রামের মধ্যেই ময়রা পাড়ার মূল মন্দির থেকে পাল্কি করে দেবী আসেন ঝাঁপানতলার মনসামন্দিরে। নেপাকুলি গ্রামের ঘোষপাড়া, ময়রাপাড়া, পশ্চিমপাড়া, তাঁতিপাড়া, আয়নাপাড়া, আদিবাসীপাড়া, মধুবাটি, উমারপুর, ঝড়োবাটি, দত্তদাড়িয়া টোন, কদম্বা, হাজরাপাড়া, থেকে দেবীর নিবেদন সামগ্রী আসে। আদিবাসী পাড়ায় নাগপঞ্চমী উপলক্ষে অনেকে নিজেদের মাটির বাড়িতে রং করেন। নেপাকুলির ঝাঁপানতলার মনসাপূজাটি প্রকৃতপক্ষে একটি পারিবারিক পূজা। তবে এই পূজায় সামিল হয় প্রতিবেশী গ্রাম থেকে আসা বহু মানুষ। যাদের পারিবারিক পূজা, সেই মণ্ডল পরিবারের দীপক মণ্ডল, মঞ্জু মণ্ডলরা জানান, এটি ২০০ বছর পুরনো পূজা। মনসার নিত্যপূজা ছাড়াও দশহরাতে গঙ্গা থেকে জল এনে দেবীকে স্নান করাবার বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। নাগপঞ্চমীর দিন মইএ সাজিয়ে বাজনাসহ মধুবাটি, উমারপুর, কদম্বা থেকে দেবীর পূজার উপাচার নিয়ে আসা হয়। আগে মণ্ডল বাড়ির পূজা, তারপর অন্যান্য গ্রামের পূজা নিবেদন করা হয়।

ঝাঁপানতলায় মনসার পাকা মন্দির কিন্তু সারাবছর ফাঁকা থাকে, কেবল বাৎসরিক পূজার বিশেষ দিনে দেবীকে এনে মন্দিরে পূজা বিধি পালন করা হয়। সেই সঙ্গে ভক্তেরা দণ্ডী কাটা, ধুনো পড়ানো ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন। পূজা উপলক্ষে পাঁঠাবলি হয়।

মণ্ডল বাড়ির পাশে বাঁশবাগানের মধ্যে মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি দিয়ে তৈরি নেপাকুলির মা মনসার আদি মন্দির। পরিবারের সদস্যরা জানান, দেবীর নির্দেশ অনুযায়ী তাকে এই মাটির তৈরি মন্দিরে রাখা হয়। তিনি কোনো পাকা মন্দিরে থাকবেননা, এমনই স্বপ্নাদেশ আছে এই পরিবারের। তাই বাৎসরিক পূজার দিনেই কেবল মাত্র ঝাঁপানতলার পাকা মনসামন্দিরে দেবীর পূজা হয়। কিন্তু সারাবছর দেবী ওই মাটির ঘরেই থাকেন।

এখানের মনসা আসলে দুটি দেড় ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পিতলের ঘট। এদের নাম কমলা ও বিমলা। এরা দুই বোন। অর্থাৎ দেবী এখানে দুই বোন রূপে বিরাজ করেন। বিভিন্ন সময় ধনী ব্যক্তিরা দেবীর কৃপায় বিপদ মুক্ত হয়েছেন, এবং বহু লোকের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় মাথার মুকুট, গলার হার সহ প্রচুর সোনার অলঙ্কার দিয়ে দেবীকে সজ্জিত করেছেন তারা। দুবেলা একটি করে মোমবাতি জ্বালিয়ে, ফুল জল দিয়ে দেবীর নিত্য পূজা চলে একেবারে সাদামাটাভাবে। আশ্চর্যের বিষয় এত গহনায় মোড়া দেবীর ঘটদুটি কোনো নিরাপত্তা বেষ্টনী ছাড়াই ওই জঙ্গলে ঘেরা মাটির ঘরে বহু যুগ ধরে একই ভাবে আছে। সম্ভবত, মনসা সাপের দেবী ব'লে তার জন্য আলাদা কোনো নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়নি। মানুষের অন্তরের সর্পভীতিই দেবীর বহুমূল্য গহনার চারপাশে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছে। নেপাকুলির মানুষেরা কমলা ও বিমলারূপী মনসাকে সংস্কারে বিশ্বাসে অত্যন্ত জাগ্রত দেবী বলে মানেন।

কালনা থানার অন্তর্গত উদয়পুর গ্রামে বেহুলা মাতার মন্দির রয়েছে। বর্ধমান জেলায় বেহুলা মাতার মন্দিরের প্রেক্ষাপটে রয়েছে প্রত্যক্ষভাবে মনসামঙ্গলের প্রভাব। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার যাত্রাপথে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের নাম পাওয়া যায়। কেতকাদাসের মনসামঙ্গলের সূত্রেই বর্ধমান জেলার বৈদ্যপুর রোডের নারকেলডাঙার সন্নিকটস্থ বেহুলা নদীর তীরবর্তী উদয়পুর গ্রামে বেহুলাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে মিথ। প্রচলিত মিথ অনুসারে হাসনহাটিতে (বর্তমানে কালনা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত) কাঙারুল শেখ নামে এক মুসলিমের বাড়ির গোয়াল ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল বেহুলা। মুসলমান হওয়ায় তারা উদয়পুরের হিন্দুদের বেহুলা পূজার দায়িত্ব দেন। সেই সময় থেকে উদয়পুরে একটি বট গাছের নীচে আষাঢ়পঞ্চমী তিথিতে বেহুলা পূজার প্রচলন হয়। পরবর্তীকালে মন্দির স্থাপন করে এখানে বেহুলা মাতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪১৪ সালে পুরনো মন্দির সংস্করণ করে পুনর্নির্মাণ করা হয়। এখানে বেহুলার নিত্যপূজা ছাড়াও আষাঢ় পঞ্চমীতে ধুমধাম করে বাৎসরিক পূজা পালন করা হয়। বেহুলার বাৎসরিক পূজায় বহু যুগের প্রথা ভেঙে নিবেদন সামগ্রী পাঠানো বন্ধ হওয়ায় বর্তমান প্রজন্মের কাছে ভিন্নধর্মের দেবীর গুরুত্ব হারিয়েছে বলে মনে হয়।

বেহুলার বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে আদিবাসীরা আসে বাজনা বাজিয়ে, পাঁঠাবলি হয়। পটের ছবিতে, টেরাকোটার শিল্পীদের তৈরি মনসাচালি বা মনসাবারিতে মনসার সঙ্গে বেহুলা

লক্ষিন্দরের প্রতিকৃতি যথাক্রমে আঁকা ও গড়া হয়। এছাড়া মনসা পালার কবিগানের আসরে , মনসাযাত্রায় মনসার পাশাপাশি সমান গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসাবে বেহুলাকে তুলে ধরা হয়। এছাড়া বেহুলা নামেই তৈরি হয়েছে একাধিক চলচ্চিত্র, টেলি ধারাবাহিক। বাঙালি সংস্কৃতিতে মনসার পাশে বেহুলার অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে। মনসার ব্যতিরেকেও বেহুলা আরাধনা লোক সংস্কৃতির গভীরে ছড়িয়ে থাকা মনসাচেতনারই স্বতন্ত্র বহিঃপ্রকাশ। উপরন্তু উদয়পুরের পূজায় হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ, শুদ্রের সহাবস্থান জাতি, ধর্মের সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধে উৎসবের মানবিক মহত্ত্বকেই তুলে ধরে।

অযোধ্যার দশহরা পরব

বাঁকুড়া জেলার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট একটি উৎসব, বিষ্ণুপুরের নিকট দ্বারকেশ্বর নদীর উত্তরে অবস্থিত অযোধ্যা গ্রামের দশহরা পরব। যে লোকাচারগুলির সমন্বয়ে এই অঞ্চলের মনসাসংস্কৃতি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে সেগুলি হল - গিন্নিপালন, ঢাকে কাঠি, স্নানযাত্রা, দণ্ডীকাটা, ভোক্তানাচ, বনমালাছেঁড়া, গঙ্গাপূজা, আগুনসন্ন্যাস, সইঘর যাত্রা, ভৈরব ও মনসার মালাবদল, ধুনোপোড়ানো ও মনসামঙ্গল পাঠ। এ অঞ্চলের মানুষ মা মনসার দহ, গিন্নিপালন, বিডরা গ্রামে মনসার সইঘর - ইত্যাদি বিষয়ে বিচিত্র মিথকে বিশ্বাসে সংস্কারে গ্রহণ করেছে।

- দশহরায় গঙ্গা পূজার পনেরো থেকে কুড়িদিন আগে একটি বিশেষ লোক অনুষ্ঠান গিন্নিপালনের মধ্যে দিয়ে অযোধ্যা গ্রামের মনসা পরবের সূচনা হয়। গিন্নিপালন মনসাপরবের সঙ্গে যুক্ত একেবারে আঞ্চলিক একটি উৎসব। বাঁকুড়ার অযোধ্যা ও পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি গ্রাম ছাড়া সম্ভবত আর কোথাও এর প্রচলন নেই।
- গিন্নিপালনের কয়েকদিন পর থেকে শুরু হয় *ঢাকে কাঠি* ও *ভোক্তা নাচ* নামক লোক অনুষ্ঠান। মনসার ঘট মন্দির থেকে মনসার দহে নিয়ে যান তারাই ভক্ত, আঞ্চলিক ভাষায় ভোক্তা। এরা প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় মাথায় ঘট নিয়ে মনসার দহে স্নান করেন, এবং ফিরে এসে এক বিশেষ নাচ পরিবেশন করেন। নয় থেকে দশদিন রোজ সন্ধ্যাবেলা ভোক্তানাচ চলতে থাকে। অযোধ্যার দশহরা উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এই মনসার ঘট মাথায় নিয়ে এই বিশেষ ভোক্তা নাচ।

- দশহরার আগের দিন রাতে পালিত হয় *বনমালাছেঁড়া* । বিচুলি ও আমপাতা দিয়ে একটা মালা গাঁথা হয়। এই মালাটি রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দশ থেকে এগারো ফুট উপরে টানানো হয়। একজন ভক্ত দৌড়ে এসে এই মালাটি ছেঁড়ে। সাধারণ মানুষ অতটা ওপরে লাফাতে পারবে না, কেবল ভক্তের পক্ষেই এমন অসাধ্যসাধন সম্ভব, এমনই বিশ্বাস এখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে।
- দশহরার দিন সকালে হয় গঙ্গাপূজা। এরপর আগুন সন্ন্যাস (সন্ন্যাসীরা আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটেন)।
- বিডরা গ্রামে রয়েছে দেবীর সইঘর। মনসার ঘট মাথায় নিয়ে সইঘরে যাওয়া এবং সেখানের উৎসব সম্পন্ন করে ফিরে আসার অনুষ্ঠান *সইঘর যাত্রা* নামে পরিচিত।
- গ্রামে রয়েছে *মা মনসার দহ,* দ্বারকেশ্বর নদীর ওপর একটি হ্রদবিশেষ। গ্রামবাসীরা বলেন, এই দহ থেকেই একজনের জালে মা মনসার ঘট উঠেছিল। দহকে কেন্দ্র করে বিশাল *স্নানযাত্রা* অনুষ্ঠিত হয়। মনসার দহে যাবার সময় মাঝপথে জনার্দনের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে মায়ের গহনা খোলা হয়।
- গ্রামবাসীদের চেতনায় ভৈরব ও মনসা ভাইবোন। ভৈরবের থানে ভাই বোনে মালাবদলের বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। পরদিন সকালে মন্দির প্রাঙ্গনে শতাধিক ভক্ত *ধুনা পোড়ায়* ।

মনসাকেন্দ্রিক অভিকরণমূলক লোকসংস্কৃতি শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনসামঙ্গলের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা লোকসংস্কৃতির উপস্থাপনমূলক শিল্পরূপগুলির পর্যালোচনা করা হয়েছে।

রয়ানী

রয়ানীর উদ্ভব ও স্থানিক সম্প্রসারণ - দেবী মনসাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ধারায় রয়ানী একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। দেশ বিভাজন পরবর্তীকালে বরিশাল তথা পূর্ববঙ্গের সেই সমস্ত পরিবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, বংশ পরম্পরায় রয়ানী পাঠের রীতি যাদের পারিবারিক সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। এদেশে এসে নানা প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হলেও পদ্মাপুরাণ পাঠের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। বরিশাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা নারীদের মাধ্যমেই বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ পাঠ পশ্চিমবঙ্গেও ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়। এই লোকাচার তথা

সংস্কারকে স্বাগত জানিয়ে গ্রহণ করে মূলত পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল (ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা ইত্যাদি) থেকে আগত উদ্বাস্তু সমাজ। পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসীদের মধ্যে পদ্মাপুরাণ পাঠ সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারে না। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলী ইত্যাদি জেলায় পদ্মাপুরাণ পাঠের ধারা অব্যাহত।

বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগণায় রয়ানীর দুটি ধারা প্রচলিত । ১) ঘরোয়া পাঠ ও ২) নাচ গান অভিনয় সংযোগে মঞ্চে উপস্থাপিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

মহিলাদের ঘরোয়া পাঠ ও গান - প্রতিদিন এক বা একাধিক পালা করে এগিয়ে কাব্যটি এক মাসে প্রথম থেকে শেষ অবধি সম্পূর্ণ পড়ার রীতি আজও প্রচলিত। গ্রামের যে সব বাড়িতে মনসা পূজা হয়, সেই সব বাড়িতে প্রতিবেশী কিছু নারী সমবেত হয়ে রাতের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই পাঠ করেন। রয়ানী বলতে উত্তর চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে এখন কেবলমাত্র পদ্মাপুরাণের নির্বাচিত জাগরণ গানকে না বুঝিয়ে শ্রাবণ মাস ব্যাপী সমগ্র মনসামঙ্গল পাঠকে বোঝায়। মূল গায়কের সঙ্গে সহায়কেরা গান ধুয়া।

মঞ্চে কথায় নাচে গানে উপস্থাপিত রয়ানী - উত্তর চব্বিশ পরগণার নিউব্যারাকপুরে , হাবড়ার বাণীপুর সহ বিভিন্ন গ্রামে, ও শহরে মঞ্চে রয়ানী গাওয়ার প্রচলন রয়েছে।

রয়ানীর মঞ্চ - মনসাপূজা উপলক্ষে গৃহকর্তার সাধ্যমত আয়োজনে মঞ্চ তৈরি হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ির উঠোনে মাদুর পেতে, উপরে সামিয়ানা লাগিয়ে বা যে বাড়িতে মনসামন্দির ও মন্দির সংলগ্ন চাতাল আছে, সেখানে রয়ানীর আসর বসে।

দল পরিচয় - নিউব্যারাকপুরে ৭০ বছর বয়স্কা শোভারাণী হালদারের ৬০ বছরের পুরনো রয়ানীর দল *শোভারাণী সম্প্রদায়* বা ৩৫ বছর বয়স্ক শোভন মিস্ত্রির পরিচালিত দল *মঞ্জুরাণী সম্প্রদায় মা মনসা সহায়* এর মত বহু দল উত্তর চব্বিশ পরগণায় রয়েছে। দলগুলির সদস্যসংখ্যা মোটামুটি দশ জন। হারমনিয়াম, বাঁশি, জুরি, খোল, করতাল- ঢাক , ঢোল - এই বাদ্যগুলি বাজাবার জন্য থাকে যন্ত্রী, বাকিরা গায়েন। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ এদের সকলের মুখস্তপ্রায়। পুরো পালা সম্পূর্ণ করতে এক মাসের ওপর সময় লাগে। পাঁচ দিন, তিন দিন বা এক দিনের আয়োজন হয় বেশি। দল এক্ষেত্রে প্রতিটি পালা থেকে নির্বাচিত পদ গান ও বর্ণনার মাধ্যমে কাহিনি শেষ করেন। সঙ্গে থাকে তালে তালে নাচ। মূল গায়েন এর সঙ্গে

আরও একজন দাঁড়িয়ে গান ও পাঠ করে। পুরুষ গায়েন পরেন ধুতি আর ফতুয়া, মহিলারা তাঁতের শাড়ি। সকলের গলায় থাকে উত্তরীয়। গায়েনরা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে পালাগান করার সময় সামনে রাখা থালা থেকে দু'হাতে দুটি চামর তুলে নেন। কোনো কোনো দলে গায়েনদের পায়ে থাকে ঘুঙুর।

উপস্থাপন রীতি - দু'জন গায়েন দাঁড়িয়ে মূল পদ গান, সেই সঙ্গে ধুয়া গায় বসে থাকা গায়েনরা এবং সকল যন্ত্রী। নাটকীয় আকর্ষণ তুলে ধরতে কোথাও কোথাও উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ আমদানি করা হয়। এই সংলাপ বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গায়েনরা নিজেদের উপভাষায় নিজেদের মত করে তুলে ধরেন।

লোকগানের ব্যবহার - মনসা-জরৎকারু ও বেহুলা-লক্ষিন্দরের বিয়ে উপলক্ষে জলভরার গান, নাপিতের ক্ষৌরকর্মের গান, অধিবাস, কনে সাজানোর জন্য পদ্মাপুরাণের সাথে যুক্ত হয়েছে জনপ্রিয় কিছু লোকসঙ্গীত।

লোকাচার - উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় মঞ্চে গাওয়া রয়ানীর সঙ্গে কিছু লোকাচারের প্রচলন রয়েছে। যেমন গান শুরুর সময় গৃহিণী কুলোয় চাল, শাড়ি, সব্জি, গামছা, পান সাজিয়ে মনসা প্রতিমার সামনে ভুজ্যি নিবেদন করেন। মনসার জন্ম, বিবাহ, লক্ষিন্দরের জন্ম, বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহ, লক্ষিন্দরের প্রাণ ফিরে পাওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গে উলুধ্বনি, শঙ্খ বাজানোর রীতি রয়েছে।

জালু মালুর বাড়ির পূজা উপস্থাপনের সময় জালুর মাকে মনসার বর দেওয়া প্রসঙ্গে পরিবারের একজনকে মঞ্চে তুলে ধরা হয় এবং তাকে দিয়ে বর প্রার্থনা করানো হয়। রয়ানীর আসরে এই রীতি *বর গাওয়া* নামে পরিচিত। চাকরি, বিয়ে, রোগমুক্তি, আর্থিক উন্নতি ইত্যাদি মনোমত বর প্রার্থনা করেন মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তি।

সনকার সাধ ভক্ষণ উপলক্ষে মঞ্চে দশ প্রকার শাক ঝুড়ি ভরে এনে, গান করেন গায়েনরা। রয়ানীর দলের পরিভাষায় এই গান *শাক তোলার গান* নামে পরিচিত।

রয়ানীর আসরে বেহুলা লক্ষিন্দরের বাসর রাতের উপস্থাপনা করা হয় অভিনব রীতিতে। লোহার ঘরের প্রতীকী হিসাবে একটি বদ্ধ হাঁড়িকে ব্যবহার করা হয়।

লখিন্দরের জিয়ান পালা গাইবার জন্য রয়ানীর আসরে ২১ টি পান, ২১ টি সুপারি, ২১ টি কলা, নারকেল, নতুন কাপড় বা ধুতি, ১ কেজি ২৫০ গ্রাম চাল ইত্যাদি দরকার হয়। এগুলি দিয়ে নতুন দেহ গঠন হয়।

পাঁচ বা তিন দিনের রয়ানীতে বেশ কয়েকবার দেবীকে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যে ভুজ্যি নিবেদন করা হয় তাতে রয়ানীর দলগুলির উপরি রোজগার হয়। এছাড়া মাঝিকে কড়ি দেওয়া, বা বরযাত্রীর পথ আটকে টাকা নেওয়া - ইত্যাদি নানা কৌশলে দলগুলির সামান্য উপরি রোজগার হয়। দলগুলির নিজ নিজ ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য এবং ঐকান্তিক ভালোবাসায় অবিচ্ছিন্ন মনসাসংস্কৃতির ধারা যুগ যুগ ধরে প্রবহমান।

মনসাপালা কেন্দ্রিক কবিগান

মনসামঙ্গল পালাকে কেন্দ্র করে যে কবির লড়াই বঙ্গদেশে লোকসংস্কৃতির চলমান ধারায় গভীর ভাবে গ্রথিত, তার প্রকৃতি সাধারণ কবিগান অপেক্ষা কিছুটা পৃথক। এখানে বিষয় বৈচিত্র নেই। চাঁদ মনসার বিবাদই একমাত্র বিষয় হলেও পুরাণ, মহাকাব্য, সমসাময়িক ঘটনাও আনুষঙ্গিক ভাবে যুক্ত হয়। এক এক জন কবির গায়নশৈলী, মনন, উপস্থাপন রীতি এক এক রকম।

দেববন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত। মনসার জন্ম, বনবাস, পূজা পালা (জেলে বাড়ির পূজা, জালু মালুর বাড়ির পূজা), চাঁদ সদাগরের কাছে পূজা চাওয়া এবং পূজা নিষিদ্ধ করায় চাঁদ সদাগরের সবংশে বিনাশ, চাঁদের বাণিজ্য পালা, লক্ষিন্দরের বিবাহ পালা, দংশন ও মরণ পালা ও একদম শেষে জিয়ান পালা।

মহিলা কবি শান্তিলতা বিশ্বাস ও মনসাপালার কবিগান - নদিয়া জেলায় এমন বহু কবিয়ালের কথা জানা যায়, যারা মনসামঙ্গলের কাহিনী কেন্দ্রিক কবিগান করে থাকেন। তবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মহিলা কবি হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন নদিয়া জেলার ফুলিয়ার কৃষিপল্লীর শান্তিলতা বিশ্বাস। বিভিন্ন কবির মনসামঙ্গলের সঙ্গে বিবিধ পুরাণপাঠের অভিজ্ঞতা তার মনসাপালার কবিগানকে সমৃদ্ধ করেছে। সঙ্গীত প্রতিভা, উপস্থাপন নৈপুণ্য, বহু বছরের অভিজ্ঞতায় আজ দুই বঙ্গেই মনসা পালা কেন্দ্রিক কবিগানের আসরে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়।

কবিগানের প্রকৃতিগত বিবর্তন - ইতিমধ্যে এই সুপ্রাচীন সংস্কৃতিতে এসেছে এক ধারাবাহিক বিবর্তন। পঁচিশ বছর আগেও মনসাপালাকে কেন্দ্র করে যে কবিগানের আসর বসত, সেখানে অবাধে চলত খিস্তি খেয়ুড়ে ভরা অশ্লীল ভাষার কাদা ছোড়াছুড়ি। ফুলিয়ার শান্তিলতা বিশ্বাসের মত লোকশিল্পীরাই প্রথম মনসাকেন্দ্রিক কবিগানকে একটি মার্জিত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। চাঁদ মনসা বিবাদের প্রচলিত কাহিনীর সাথে যুক্ত হয় একাধারে পুরাণের আনুষঙ্গিক প্রেক্ষাপটের সমর্থন, অপরদিকে মনসামঙ্গলের কাহিনীর অন্তরালে মানবজীবনের অন্তর্নিহিত সত্যের তাৎপর্যে দেহতত্ত্বের রূপক বিশ্লেষণ।

কবিয়ালেরা বলেন, বাস্তবে প্রতিটি সম্ভাব্য পিতা বছরে একবার গর্ভবান হন। যে গর্ভভার তিনি মস্তকে ধরে রাখেন অধিকপক্ষে তিন মাস কুড়ি দিন। অন্যদিকে সম্ভাব্য মাতারা বছরে বারো বার গর্ভবতী হন। পুরুষ গর্ভভার ধরে রাখতে না পারলে নারীর কাছে আসেন। নারী ঋতুবতী থাকলে তিনি পুরুষের গর্ভভার গ্রহণ করে অন্তঃসত্ত্বা হন। নারীদেহে সেই গর্ভ প্রতিপালিত হয় দশ মাস দশ দিন। সুতরাং পুরুষ নারী মিলিয়ে মোট চোদ্দ মাসে এই দেহ পূর্ণ হয়। যেকোনো স্বাভাবিক চেহারার মানবদেহ এই চোদ্দ পোয়া, আশি মুঠ তথা সাড়ে তিন হাতেই সম্পূর্ণ হয়। এর এক চুলও কম বা বেশি নয়। মনসামঙ্গলের চাঁদ বনিকের চোদ্দ তরী আসলে চোদ্দ পোয়ায় গঠিত মানবদেহের রূপক। নারী দেহের নাভী থেকে ঊর্ধ্বদেশ হল কাব্যের উত্তরদেশ, যেখানে আছে দুটি দধিভাণ্ড এবং তার ওপরে মুখমণ্ডলরূপ আয়নামহল। আর নাভীর নিম্নাঙ্গ হল দক্ষিণদেশ। সেখানে মহাপদ্মের নীচে আড়াই পাকে বন্ধন করে আছে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, যাকে বুকে চেপে সেই সাত সমুদ্র পারের অতলে বাস করছেন দেবী মনসা। বহু অর্থ ব্যয় করে দুর্গা, কালি, বা মনসারূপি শক্তির আরাধনায় জাতির মুক্তি নেই। প্রতিটি পুরুষের সহধর্মিণীই জীবন্ত মনসা। নারীদেহে বাহাত্তর হাজার সর্প বাস করে যা তার নাড়ীস্বরূপ। এর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রধান। এদের মধ্যে সুষুম্না জাগরিত হলে মনসার তথা জ্ঞানের তথা উদার চৈতন্যের আবির্ভাব হয়।

চর্যাপদ ও মনসাপালার কবিগান - চর্যাকারদের ধর্মমতে বোধিচিত্ত বা মহাসুখ লাভই সাধকের পরম কাম্য। মনসা পালার কবিয়ালেরাও সেই মহাজাগতিক বোধকেই দেবী মনসা রূপে বর্ণনা করেন। আর মস্তকে উত্তীর্ণ চৈতন্য যা চর্যাকারদের মহাসুখ, কবিয়ালদের অনুভবে তা জগতের

প্রতিটি পুরুষের মস্তকে ধরে রাখা সেই গর্ভ অবস্থা, মনসাকাব্যে তা চন্দ্রধরের চন্দ্র। চর্যাগানের বোধিচিত্ত আর কবিগানের মনসা এক হয়ে যায় এবং দুটি ক্ষেত্রেই রূপকের আড়ালে ধর্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের গুহ্য অবস্থানও লক্ষ্য করা যায়।

সাংস্কৃতিক সমন্বয় - একটা সময় পর্যন্ত বৈষ্ণবেরা মনসা সংস্কৃতি থেকে দূরেই অবস্থান করতেন। কিন্তু বর্তমানে বাড়িতে বা মন্দিরে যারা নানা ভাবে মনসার সাধনা করছেন, তারা অনেকেই বৈষ্ণব। মনসা পালার কবিয়ালেরা কবির আসরে বিভিন্ন পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের পদ বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে মনসা বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ।

পটশিল্পে মনসামঙ্গল

পটশিল্পের উদ্ভবের প্রাথমিক পর্যায়ে পটুয়ারা জনপ্রিয়তার জন্য মঙ্গলকাব্য, মহাকাব্যের পৌরাণিক আখ্যানকেই বেছে নিয়েছিল। এই সব আদি পটের মধ্যে অন্যতম বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী কেন্দ্রিক মনসার পট ও পটের গান।

পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা থানার অন্তর্গত নয়া গ্রাম। বর্তমানে গ্রামের বাহাত্তরটি পরিবারের ছোট থেকে বড় সকলেই পূর্বপুরুষ সূত্রে পটের কাজের সঙ্গে যুক্ত। গ্রামে মুসলিম পটুয়াদের মুখে মঙ্গলকাব্যের দেব দেবীর গান সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে।

মনসার পট মূলত দুই প্রকার। আয়তাকার পট ও জড়ানো পট। আয়তাকার পটটিতে একটিই ছবিতে রয়েছেন সর্পাসনা দেবী মনসা, মাথায় পঞ্চনাগ, ডানে চাঁদ সদাগর ও বামে বেহুলা। জড়ানো পট আবার দুই প্রকার। আড়াআড়ি জড়ানো পট আর লম্বা জড়ানো পট। আড়াআড়ি জড়ানো পটে চার থেকে পাঁচটি ছবিতে মনসামঙ্গল কাব্যকথার মূল বিষয় রূপায়িত হয়। এগুলি মূলত ঘর সাজাবার উপকরণ হিসেবে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয়। লম্বা জড়ানো পট বেশ দীর্ঘ। এখানে ঘটনাক্রম অনুসারে প্রায় পনের থেকে কুড়িটি ছবি থাকে। এই ছবিগুলি দেখিয়ে পটুয়ারা মনসামঙ্গল কাব্য কাহিনী কেন্দ্রিক গান গাইতেন ছবির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে।

পটুয়াদের মতে মনসামঙ্গলের মত কোন কাব্য বা পুরাণ তাদের পড়া নেই। লোক মুখে শুনে শুনে মূল কাহিনির সম্পর্কে তারা জেনেছেন এবং সেই লোকশ্রুত জ্ঞানকে অবলম্বন করেই তারা যুগ যুগ ধরে পট আঁকছেন, গান রচনা করছেন ও গাইছেন। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের

চরিত্রহীন ধোনা মোনা এই কারণেই পটের গানের নেতার দুটি শিশু পুত্রে পরিণত হয়। আবার দেবসভায় নিজ হাতে ধৌত বস্ত্রের উজ্জ্বলতা দেখিয়ে স্বামী সহ ছয় ভাসুরের প্রাণোদ্ধার পটুয়া শিল্পে জটিল ঘটনাক্রমের সহজ সমাধানেরই ফল। তবে মনসামঙ্গল কাব্য প্রভাবও মনসামঙ্গল পটের গানের কিছু অংশে স্পষ্ট। এমনকি কোন কোন পঙক্তি একেবারেই কেতকাদাসের কাব্য থেকে নেওয়া। মনসামঙ্গল কাব্যের পংক্তি সমূহের প্রায় হুবহু ব্যবহার লোকগানের নিজস্ব ধর্মকে লঙ্ঘিত করে, স্বছন্দ বিনির্মাণের গতিকে করে অবরুদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই জন্যই মনসামঙ্গল পটের গানের কিছু অংশে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল।

বাঁকুড়া জেলার ভরতপুর গ্রামে আঠেরোটি পটুয়া পরিবারের বাস। ভরতপুরের শিল্পীরা সেখানে প্রচার পরিচিতির দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে আছেন। নয়ার মত এরাও মনসার আয়তাকার ও জড়ানো দুরকম পট বানালেও পুরো পাড়ায় মাত্র দুতিনটি মনসার পটের দেখা পাওয়া গেল। জড়ানো পটে রয়েছে মনসার ছবি, জালুমালু দুই ভাইয়ের মনসা পূজার ছবি, চাঁদ কর্তৃক মনসার পূজা ঘট ভাঙা, স্বামীকে বাঁচাতে শিবের সামনে বেহুলার মিনতির ছবি, সবশেষে আবার মা মনসার পূজার ছবি রয়েছে। আর আয়তাকার পটে সর্পাসনে শোভিতা দেবী মনসার একক ছবি।

মনসাযাত্রা - সিনেমা টেলিভিশনের সঙ্গে নতুন নতুন মাধ্যমে বিনোদনের দুনিয়া আজ বহুমুখী। তবু বাংলার লোকসমাজে যাত্রাপালা আজও স্বতন্ত্র আবেদন রাখে। মনসামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে মনসাযাত্রা মনসার পালাগান নামেই অধিক প্রচলিত। বাংলায় প্রচলিত মঙ্গলকাব্যগুলিও ছিল বহু প্রাচীনকাল থেকে গ্রামজীবনে প্রচলিত পাঁচালীর বিবর্তিত ও বিবর্ধিত রূপ। মনসার পাঁচালী গাইবার সময় গায়েন একা দেবীর সাজে সজ্জিত হয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে মনসামঙ্গলের বিভিন্ন পালা গাইতেন। এই পাঁচালীকেই দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তীকালে লোকযাত্রায় রূপান্তরিত করা হয়। কালক্রমে মনসা যাত্রাপালা মনসার পাঁচালীর চাহিদা অনেকটা কমিয়ে দিলেও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামেগঞ্জে লোকসমাজে মনসার পাঁচালী আর মনসাযাত্রার দু'টি স্বতন্ত্র ধারা আজও বহমান।

পালা বিভাজন - দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় আঞ্চলিক লোকবিশ্বাস ও দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী অজস্র দল মনসা, শীতলা ও বনবিবি এই তিন দেবীর মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক যাত্রাপালা উপস্থাপন করে থাকেন। এই সব দলের অভিনীত মনসাযাত্রা মূলত চারটি পালায় বিভক্ত –

১) চাষ পালা ;

২) জন্ম পালা ;

৩) বাণিজ্য পালা এবং

৪) ভাসান পালা ।

মনসা যাত্রাপালার মঞ্চ বলতে বেশির ভাগই গৃহস্থের বাড়ির উঠোন, যেখানে মাথার ওপর একটি তাবু টানানো, আর মাটিতে প্লাস্টিক বা বস্তা জাতীয় কিছু পাতা থাকে। ওপরে তাবুর সঙ্গে বাঁশের কঞ্চি বা কাঠের সাহায্যে দড়ি বেধে ঝোলানো আট দশটি মাইক্রোফোন, মঞ্চের পেছন থেকে দড়ি টেনে এগুলির উচ্চতা প্রয়োজন মত বাড়ানো কমানো হয়। মঞ্চের সামনে পেছনের ব্যাবধান বজায় রাখার জন্য থাকে পর্দা। সম্পন্ন গৃহস্থ পালাগানের জন্য তৈরি করান কাঠ দিয়ে মাটি থেকে তিন-চার ফুট উঁচু মঞ্চ। মঞ্চের ওপরে কার্পেট। মাথার ওপর থাকে সামিয়ানা। কোন কোন দলের আছে স্টেজ লাইট ও লেজার লাইট। তবে সব দলেই মঞ্চে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাবহার হয় তিন ধাপের কাঠের সিঁড়ি। অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রয়োজন মত এই ধাপ গুলির ওপরে দাঁড়িয়ে অভিনয় করেন। যাত্রাকালে ব্যাবহার হয় ইয়ামা, জিপসি, নাল, করতাল, ডুগি তবলা এই সকল বাদ্যযন্ত্র। চরিত্রের অভিনেতা বা অভিনেত্রীর পায়ে বাঁধা থাকে ঘুঙুর।

লোকশিল্পীদের বিপর্যস্ত ব্যক্তিজীবন - শুধুমাত্র যাত্রার কাজে এদের সংসার চলে না, শিল্পী কলাকুশলীদের প্রায় সকলেই প্রায় দিনমজুর। চড়া সাজগোজ আতিশয্যপূর্ণ অভিনয় আর উচ্চকিত গান বাজনার অন্তরালে দলের শিল্পী কলা-কুশলীদের ব্যক্তিগত জীবন এক বিপন্ন আর্থ সামাজিক অবস্থার নজির।

মনসামঙ্গল কাব্য ও মনসার পালাগান – চাষপালায় রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব , জন্মপালায় পুরাণ, মঙ্গলকাব্যের অভিনব যোগসূত্র স্থাপন, মনসামঙ্গল কাব্য অনুসারী মনসাযাত্রার বাণিজ্যপালায় ঊষা অনিরুদ্ধের জন্ম প্রসঙ্গ, বৃদ্ধা ধাত্রী ও দ্বারিক প্রসঙ্গ, বিধাতা

কর্তৃক লক্ষিন্দরের ভাগ্য লিখন, একই পাঠশালায় বেহুলা লক্ষিন্দরের শিক্ষাগ্রহণ, হনুমান ও চন্দ্রধর বণিকের মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনায় কাহিনির কিছু রদবদল ঘটিয়েছেন। বাণিজ্য পালার চাঁদের ভিক্ষা, সনকার সাধ , হিজরা নাচ ইত্যাদি প্রসঙ্গে লোকাচার, সামাজিক ক্রিয়াকলাপের দৃশ্যায়ন করতে গিয়ে সরাসরি দর্শকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন দলের কুশীলবেরা। পুরাণ বা মঙ্গলকাব্য ব্যতিরেকে পালাকারদের স্বরচিত সংযোজিত ; *নয়াবাজার পর্ব, গদাই পাচির বিয়ে* লোকসমাজে ভাসান পালাকে সর্বাধিক জনপ্রিয় করে তুলেছে। যারা মনসাযাত্রা দেখেননি সেই বহু সংখ্যক মানুষের কাছে এ কাহিনি অজানা।

পালাগানে পালাকারদের সৃষ্ট গান ছাড়াও জনপ্রিয় লোকগীতি, সিনেমার গান সব মিলিয়ে প্রচুর গানের ব্যবহার করা হয়। যাত্রাপালায় শিল্পীর মুখে এবং পটুয়া পাড়ায় পটকারদের মুখের গানের অংশ যেখানে হুবহু মিলে যায় সেখানে মনসাসংস্কৃতির প্রতিগ্রহণের ধারা লোকসংস্কৃতির এক আঙ্গিক থেকে অপর আঙ্গিকে যে প্রভাব ফেলে তাও স্পষ্ট হয়। যাত্রার অভিনেতা অভিনেত্রীরা বেশিরভাগই স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত গ্রামের মানুষ হওয়ায় তাদের ভাষাভঙ্গি উচ্চারণে আঞ্চলিক প্রভাব স্পষ্ট।

লোক বিশ্বাসের মঞ্চায়ন – লোহার বাসর ঘর নির্মাণ সম্পূর্ণ করে বিশ্বকর্মা চাঁদের ভবনে ফিরে এলে চাঁদ তাকে বাবলা গাছের প্রেতনীর হাত থেকে বাঁচতে উত্তরের পথে ফিরতে নিষেধ করে। চাঁদের মত সুপুরুষের পক্ষে প্রেতনীর ভয় পাওয়ার মত অসংগত ঘটনা পালাকারদের সংযোজন। রাতের অন্ধকারে বাবলা গাছে প্রেতনী প্রসঙ্গে গ্রামবাংলায় প্রচলিত লোকবিশ্বাসের প্রভাব স্পষ্ট।

দীর্ঘকালের অনুশীলনে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মনসাযাত্রার দলগুলির চেতনায় জ্ঞাতে অজ্ঞাতে এক অবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রবহমান। লোককথা, লোকাচার, লোকভাষা সর্বপরি লোকগানের এক মস্ত বড় ভাণ্ডার মনসা সংস্কৃতির প্রতিগ্রহণের এই ধারায় ধরা আছে। লোকসাহিত্যের এক বৃহৎ চর্চার কেন্দ্র মনসাযাত্রার মত লোকযাত্রার বিস্তৃত ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ।

তৃতীয় অধ্যায় - মনসামঙ্গল কাব্য ও বাংলা নাটক

দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণ। মনসামঙ্গল কাব্যের মূল অবলম্বন চাঁদ মনসার দ্বন্দ্ব। সর্বাধিক জনপ্রিয় এই মঙ্গলকাব্যের কাহিনি সাহিত্যের অন্যান্য রূপের পাশাপাশি নাটকেও ব্যবহৃত হয়েছে। এ

ক্ষেত্রে মাইলস্টোন শম্ভু মিত্রের চাঁদ বণিকের পালা। অনেক গবেষণাপত্রে এবং বহু বিদগ্ধ জন কর্তৃক বহু আলোচিত, বিশ্লেষিত হওয়ায় এই নাটকটি আর এ পর্বের নির্বাচিত নাটকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করছিনা। নিম্নলিখিত নাটকগুলি অবলম্বনে নাটকের ক্ষেত্রে মনসামঙ্গলের প্রতিগ্রহণ তথা বিনির্মাণের ধারাটির পর্যালোচনা করা হবে -

- বেহুলা - হরনাথ বসু (১৯১০)
- চাঁদ সদাগর - মন্মথ রায় (১৯২৭)
- চাঁদ সদাগর(বেহুলা) - পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩০)
- মনসামঙ্গল - তারাশঙ্কর মুখার্জী (১৯৫৯)
- সওদাগরের নৌকা - অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৯)
- মনসাকথা - শেখর দেবরায় (২০০২)
- মনসামঙ্গল - উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় (২০১৮)

হরনাথ বসুর *বেহুলা* সম্ভবত মনসামঙ্গল অবলম্বনে লেখা প্রথম নাটক। মঙ্গলকাব্যের চাঁদ মনসার সংঘাতকে আর্য অনার্যের তথা শিব শক্তির সংঘাতের প্রতীকী রূপে উপস্থাপনা করা হয় এখানে। মনসা এ নাটকে মঙ্গলকাব্যের আদলে নয় পুরাণের আদলে নির্মিত দেবী। নাগপর্বতে মণিভদ্রার বন্দিত্ব থেকে ছদ্মবেশী বেহুলা দুর্গম দুরারোহ পথে পার্বত্য খাদের ওপর দিয়ে দড়ি বেয়ে উঠে যেভাবে লক্ষ্মীন্দ্রকে উদ্ধার করে, তাতে এ নাটকে তার সাহসিকতা বুদ্ধিমত্তা তথা বীরত্ব এক অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছে। বিশ্বের কোন জীবকে অবহেলা করেই যে বিশ্বপতি শিবের সেবা সফল হতে পারে না নিজ জীবন অভিজ্ঞতায় সে সত্য পরিস্ফুট হবে চন্দ্রধর বণিকের চেতনায়। অভিনব প্রেক্ষিতে চাঁদের এই মানস বিবর্তনের দৃশ্যে পরিস্ফুট হয় ট্রাজেডি প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল কথিত *purguation of imotions* এর তত্ত্ব। চাঁদের সঙ্গে ভাবমোক্ষণ বা চিত্তশুদ্ধি ঘটে দর্শকেরও।

নাগকন্যা মনিয়া এখানে মঙ্গলকাব্যের মনসার প্রতিভূ। অনার্য মেয়েটি গুরুর শিক্ষায় সুশিক্ষিত, মার্জিত, সংযত উদার হয়ে ওঠে এবং নিজ গুণে মনিভদ্রা নামে নাগকুলের অধিশ্বরী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবল নাগবিদ্বেষী চন্দ্রধরের ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তি দিতে তৈরি হয় সে।

নরবলির আয়োজন করে আর্যদের শেষ করার নেশায় উন্মত্ত হয় মনিভদ্রা। এভাবেই আর্য অনার্য সংঘাতকে তুলে ধরা হয়েছে মনসামঙ্গলের প্রেক্ষাপটে।

মনিভদ্রা, বেহুলা, লক্ষ্মীন্দ্র, চাঁদ, আস্তিক এরাই নাটকের মুখ্য চরিত্র রূপে কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, আর মরিয়ম, নেড়া চম্পাবাসী বৃদ্ধ ও তার পৌত্র, ঘটক ভট্টাচার্য এরা উপস্থাপিত হয়েছে গৌণ চরিত্র হিসেবে। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করায় চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন বাকরীতির ব্যবহার সংলাপকে করেছে জীবন্ত। মঙ্গলকাব্য থেকে বেরিয়ে এসে কোথাও অরণ্যচারী, কোথাও বিত্তশীল, কোথাও বা নিম্নবিত্তের যাপনকে তুলে ধরেছেন বাস্তবসম্মত পরিবেশ অবলম্বনে। এভাবেই মঙ্গলকাব্যের প্রেক্ষাপটে নাটকীয় উপাদানগুলির যথাযথ প্রয়োগ ঘটেছে।

মন্মথ রায়ের *চাঁদ সদাগর* নাটকে দম্ভের জড়ত্ব কাটিয়ে আত্মনিবেদনেই মুক্তির পথ দেখানো হয়েছে। অহঙ্কার পতনের মূল - মানব জীবনের এই চরম সত্য নিজ জীবনে ধারণ করেছেন চাঁদ বণিক। আত্মম্ভরিতা এবং সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষের জীবনে স্বাভাবিক ভাবেই নেমে আসে একের পর এক বিপর্যয়। শেষ অবধি ব্রহ্মজ্ঞানের জাগরণ হলে অপসৃত হয় অজ্ঞানতার অন্ধকার। পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন তথা যথার্থ ভক্তির মধ্যে সে খুঁজে পায় শান্তির সন্ধান। মানবজীবনের এই সাধারণ সত্যের রূপকেই মন্মথ রায় মনসামঙ্গল কাব্যের নাট্যরূপ নির্মাণ করেছেন।

অস্তিত্বের সঙ্কটে জর্জরিত মানুষের অসহায়তা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, নিরুপায় হিংস্রতা, অপরাধবোধ, হীনমন্যতা, স্নেহ, করুণা সব মিলিয়ে এ নাটকের মনসা সাধারণভাবে মনসামঙ্গল কাব্যধারার দেবী চরিত্রের থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র । অন্যদিকে অন্ধ সংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ চাঁদের উগ্র পৌরুষও মনসামঙ্গলের চেনা ছকের বাইরে এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। পাশাপাশি বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহকে কেন্দ্র করে যুক্ত হয়েছে এক নতুন আখ্যান, যা সরাসরি প্রভাবিত করেছে পরবর্তীকালে মনসামঙ্গল কেন্দ্রিক নির্মিত চলচ্চিত্রকে।

মন্মথ রায়ের নাটক অবলম্বনে প্রফুল্ল রায়ের সিনেমা *চাঁদ সদাগর* এ এবং বেশ কিছু বছর পরে জাহির রায়হান পরিচালিত *বেহুলায়* কাহিনির মোড় ঘুরিয়েছে বেহুলার ময়ূর নাচ শেখার বৃত্তান্ত।

মনসাকাহিনিতে ধারাবাহিকভাবে বেহুলার ময়ূর নাচ শেখার এই অভিনব কাহিনি সংযোজনের কৃতিত্ব মন্মথ রায়ের।

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের *চাঁদ সদাগর (বেহুলা)* নাটকে চাঁদ বণিকের দুর্দমনীয় পৌরুষ উগ্র একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত। একের পর এক বিপর্যয়ের কবলে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে অস্তিত্বের শেষ অবলম্বনটুকুও বিধ্বস্ত হলে ইষ্ট দেবতাই ভক্তের প্রতিপক্ষের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের সূত্রটুকু ধরিয়ে দিয়ে সমঝোতার পথ দেখায়। এই সমঝোতায় চাঁদ হৃতসর্বস্ব ফিরে পায়, অবসান হয় তার একনায়কতন্ত্রের দীর্ঘ অধ্যায়ের।

এ নাটকে জীবন ও জীবিকার জন্য সাধারণ মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা হারানোর দিকটি নেড়া চরিত্রে ধরা দেয়। আবার অর্থই অনর্থের মূল - এই বোধ থেকে জালু মালুর মা লখিয়া মনসা পূজা করে ধনী হতে ভয় পায়। নারীর কাছে তার সাংসারিক কল্যাণ যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ লখিয়ার আপাত হাস্যকর আচরণে কৌশলে সে বিষয়টির প্রকাশ ঘটিয়েছেন নাট্যকার।

তারাশঙ্কর মুখার্জির *মনসামঙ্গল* নাটকে পালাগানের মোড়কে নাটকে মনসামঙ্গলের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। পালাগানের আদলেই এ নাটকেও প্রায় প্রতিটি সংলাপের সঙ্গে সহজ কথায় রচিত গান জুড়ে আছে। বিনোদ ওঝার বিষ ঝাড়ার গান আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পালাগানে লক্ষিন্দরকে প্রাণ ফিরিয়ে দেবার জন্য মনসার বিষ তোলার গানের মিল লক্ষ্যনীয়। গ্রামবাংলায় সাপের কামড়ের প্রতিকার স্বরূপ মন্ত্র তন্ত্র ঝাড় ফুক এর ওপর যে লোকবিশ্বাস, তার প্রতিফলন ঘটেছে নাটকে। বিনোদ ওঝার শক্তি পরীক্ষা করতে মনসার শাল গাছে বাণ মারায় কালো যাদু বা black magic বা চলতি কথায় তুকতাকের প্রকাশ দেখা যায়। লোকসমাজে প্রচলিত মনসার পালাগান, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকসঙ্গীত সব মিলিয়ে এক সার্বিক মনসাসংস্কৃতির এক ব্যপ্ত রূপ তথা সামগ্রিক চেতনা তারাশঙ্কর মুখার্জির মনসামঙ্গল নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধরা আছে।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় *সওদাগরের নৌকা* নাটকে অন্তবিহীন পথে চলমান জীবনের জয়গান গেয়েছেন। ১৯৭৬ এর ৩০এ অক্টোবর নান্দীকারের প্রযোজনায় প্রথম অভিনয় হয়। প্রসন্নর ভূমিকায় অভিনয় করেন স্বয়ং নাট্যকার। মনসামঙ্গলের প্রত্যক্ষ বিনির্মাণ না হলেও জীবনের অন্তহীন চলমানতার চিরন্তন ভাবসত্য বহনকারী এ নাটকে মঙ্গলকাব্যের চাঁদ বণিকের জীবন

যেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায় বারবার আভাসিত হয়। প্রসন্ন সতী কালো আশার জীবন আবর্তে ধরা দেয় কখনো শিব পার্বতীর গার্হস্থ জীবন, কখনো চাঁদ মনসার বিবাদ ও সমঝোতার ছবি। সওদাগরের নৌকা আমাদের জীবন তরণীর প্রতীকী, যেখানে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজনে চাঁদের মনসা পূজার মত প্রসন্নকে গোদা মালোর চরিত্রে অভিনয় করতে হয়।

দক্ষিণ আসাম বা বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট মনসাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি *ওঝার গান* এর আদলে নাট্যকার অভিনেতা শেখর দেবরায়ের *মনসাকথায়* একাধারে বহুমাত্রিক তাৎপর্যের প্রতিফলন দেখা যায়। জাতিভেদ, আর্য অনার্য সংঘাত, ধর্মীয় মৌলবাদ, পুঁজিবাদ, উগ্র পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা, শ্রেণি সংগ্রাম ইত্যাদি বহুবিধ তাত্ত্বিক ভাবনা এক কৃত্রিম উপভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে নাটকে।

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের *মনসামঙ্গল* নাটকে শিব বা ইন্দ্র নয় নিজের স্বাধীন যুক্তি বুদ্ধিকেই বেহুলা দেবত্বের আসনে বসিয়েছে এবং জয় অর্জন করেছে। ভূমিকায় নাটকের প্রধান উৎস কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে নাট্যকার স্বকীয় কল্পনায় চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে অনেক বেশি মানবিক। সুগায়ক চাঁদ বণিক ক্ষমতার উগ্র আস্ফালনে মনসার সঙ্গে বিবাদে হারিয়ে ফেলে তার সুকণ্ঠ। যে চাঁদ চ্যাংমুড়িকানি বলে সর্বদা মনসার প্রতি ঘৃণার প্রকাশ করেছে, সম্পদ বোঝাই বাণিজ্য তরীর ভরাডুবিতেও মনসা পূজা না করার নিজ প্রতিজ্ঞায় যে অটল ছিল, সাত পুত্রের প্রাণ গেলেও মনসার কাছে যে মাথা নত করেনি, সুকণ্ঠ হারিয়ে সে হাহাকার করেছে, দেবী সম্বোধনে মনসার কাছে কাতর আর্তি জানিয়েছে, প্রাণের বিনিময়েও তিনি যেন তার সুর ফিরিয়ে দেন। মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের মতই এ নাটকের চাঁদ কামুক, নিজের কামোত্তেজনায় যে হারায় মহাজ্ঞান। তবে ছদ্মবেশী মনসার সামনে নিজের ছয় পুত্রকে বলি দেওয়ার এবং স্ত্রী সনকাকে দাসী করে রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় কেবল হিতাহিত জ্ঞান হারানো নয় বরং নৃশংস হিংস্র বর্বরোচিত মনোভাবের করে তুলেছেন নাট্যকার। এ হেন চাঁদের মুখে সুর হারানোর হাহাকার, এবং জীবনের বিনিময়েও সুর ফিরিয়ে দেবার আর্তি, তার শিল্পী সত্তার প্রতি চরম মমত্বের প্রকাশ। পাশাপাশি শিল্পের প্রতি চাঁদের এই দুর্বলতা তাকে অনেক বেশী মানবিক করেছে।

সনকা নিজ কনিষ্ঠ সন্তানের মৃত্যুতে পাগলিনী প্রায় হয়ে বেহুলাকেই তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী করে তাকে চুল ধরে প্রহার করেছে, সঙ্গে পিশাচিনী, খণ্ড কপালিনী ইত্যাদি বলে অকথ্য ভাষায় চলেছে গালিগালাজ। আবার বেহুলা তাকে যখন লক্ষিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনবে বলে আশ্বস্ত করেছে, সন্তানকে ফিরে পাবার আশায় তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাকে প্রহারের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে এবং পুত্রবধূর কাছে ক্ষমা চেয়েছে সনকা। শেষ সন্তানকেও হারিয়ে ফেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে এ হেন আচরণ নাটকের সনকাকে অনেক বেশি জীবন্ত ও মানবিক করে তুলেছে। স্বামীর মৃত্যুর সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত বেহুলা জীবনের সব রং সে যে আস্বাদন করতে চেয়ে বাসর ঘরে রতি প্রার্থনা করে। আবার লক্ষিন্দর নিজ মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা জেনে আড়ষ্ট হয়ে কোনও প্রকারে আতঙ্কের রাতটা পার করতে চেয়েছে। এভাবেই নাট্যকারের তুলিতে প্রতিটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক রূপ মানবিক ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নাটকের শেষে মনসার উক্তিতে মানুষকে বাঁচাতে সাপের বিষ দিয়ে ওষুধ তৈরির কথায় তার প্রকৃত দেবীত্বের পথ প্রশস্ত হয়। আর সেই পথেই অ্যান্টি ভেনাম সিরামের ওপর গবেষণায় সাফল্য নিয়ে নতুন রূপে রূপক সাহার তরিতাপুরাণ উপন্যাসে ফিরে আসে মনসা।

চতুর্থ অধ্যায় - বাংলা চলচ্চিত্রে মনসা কাহিনীর প্রতিগ্রহণ

মনসামঙ্গলের জনপ্রিয় কাহিনিকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রের বিনির্মাণ হয়। এর চলন দুটি স্বতন্ত্র ধারায়। একটি ধারায় মনসামঙ্গলের মূল কাহিনিই চলচ্চিত্রের আধার, আর অপর ধারায় কোনও একটি পারিবারিক বা সামাজিক কাহিনিতে দেবী মনসার মাহাত্ম্য তুলে ধরা হয়। দুই বাংলায় এই উভয় ধারার চলচ্চিত্রের নির্মাণ বিনির্মাণের ধারায় দ্বিতীয় ক্ষেত্রের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্যনীয়। প্রথম ধারা, মনসামঙ্গলের কাহিনি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র - এই ধারায় এ যাবত পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ৪টি চলচ্চিত্র হল -

- চাঁদ সওদাগর, পরিচালনা প্রফুল্ল ঘোষ, ১৯৩৪
- বেহুলা, পরিচালনা জাহির রায়হান, ১৯৬৬
- বেহুলা লক্ষিন্দর, পরিচালনা অমল দত্ত, ১৯৭৭
- সতী বেহুলা, পরিচালনা মনোজ কুমার, ২০১০

মন্মথ রায়ের লেখা পৌরাণিক নাটক *চাঁদ সদাগর* অবলম্বনে ১৯৩৪ এ প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় *চাঁদ সওদাগর* সিনেমাটি নির্মিত হয়। এই সিনেমায় ধীরাজ ভট্টাচার্য লক্ষিন্দর চরিত্রে, অহীন্দ্র চৌধুরী চাঁদ সদাগর চরিত্রে, দেববালা মনসা চরিত্রে, নীহারবালা নেতা ধোপানী চরিত্রে এবং শেফালিকা দেবী বেহুলা চরিত্রে অভিনয় করেন। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে চলচ্চিত্রটি দেখার সুযোগ নেই, তাই এর নিবিড় বিশ্লেষণ করা গেল না।

মনসামঙ্গলের করুণ রসাত্মক জনপ্রিয় কাহিনি অবলম্বনে বিশিষ্ট সাহিত্যিক জাহির রায়হানের নির্দেশনায় মুক্তি পায় *বেহুলা* চলচ্চিত্রটি। চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় আমজাদ হোসেন। এই সিনেমায় বেহুলা ও লক্ষিন্দর চরিত্রে অভিনয় করেন কোহিনূর আক্তার সুচন্দা এবং আব্দুর রজ্জাক আর মনসা চরিত্রে সুমিতা দেবী। সিনেমাটি সেই সময় চরম জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্যিক সাফল্য পায়। মনসামঙ্গলের সাহিত্যে বিনির্মাণের যে বিস্তৃত ধারা, সেখানে চাঁদ বণিকের পৌরুষ আর বেহুলার সতীত্বেরই জয়জয়কার। চলচ্চিত্রে জাহির রায়হানের *বেহুলা*ও সেই ভাবধারার প্রতিনিধি স্থানীয়। চাঁদ বণিক আর মনসার বিবাদ এ সিনেমাতে নেহাতই সামান্য ভূমিকা নিয়েছে। অপরপক্ষে বেহুলার প্রেম, দৃঢ়তা, তথা অসাধ্য সাধনই হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্রের কাহিনির অবলম্বন।

সিনেমাটির শুরুতে দর্শকের সামনে যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে পদ্মাপুরাণের প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিহিত। বেহুলা সেখানে সকল সংসারী মানুষের প্রতীক। আর গাঙুর হল সংসার সমুদ্র। বিড়ম্বিত ললাট লিখনকে মুছে নিজের হাতে বেহুলা পরেছে সৌভাগ্যের দৃপ্ত জয়টিকা। যে বেহুলার মত শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আশাকে সম্বল করে মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে জীবনযুদ্ধে তারই জয় হয়। বেহুলা লক্ষিন্দরের কাহিনি বা মনসামঙ্গল দেবতার নয় মানুষেরই জয়গাঁথা। মনসামঙ্গলের কাহিনিকে যে অভিনব আঙ্গিকে দেখানো হয়েছে তাতে রূপায়িত হয়েছে বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহ পূর্ব প্রেম, লক্ষিন্দরের সর্প দংশনের ভিন্ন প্রেক্ষাপট, বিশ্বকর্মার পরিবারিক জীবন, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বেহুলার অগ্নিপরীক্ষা, স্বর্গসভায় বেহুলার ময়ূর নাচের প্রদর্শন ইত্যাদি প্রসঙ্গ। *বেহুলা*'র শীর্ষভাগ জুড়ে ব্যবহৃত তেরোটি গান কখনও ঘটনা প্রবাহের মাধ্যম রূপে, কখনও আবেগ ঘন প্রেমের উচ্ছাসে, কৌতুক তথা হাস্যরসের

উপস্থাপনে, গানের মধ্যে কবিতার ব্যবহারে, সর্বোপরি মর্মান্তিক বেদনার আবহ তৈরি করে সিনেমাটিকে করে তুলেছে আদ্যান্ত গীতিময় ।

জাহির রায়হানের চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রশংসক ছিলেন সমকালীন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিনহা প্রমুখ বাংলা সিনেমার প্রথম সারির নির্মাতাগণ। নদীতে গলা অবধি জলে চারপাশের সখীদের হাতের পারস্পরিক শৃঙ্খলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বেহুলা – *ও বেহুলা সুন্দরী* গানের দৃশ্য, অথবা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপে সুসজ্জিত লোহার বাসর ঘর... লক্ষিন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলার আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে সারিবদ্ধভাবে পর পর সেই প্রদীপ সমূহ পর পর নিভে যাওয়া ও অন্ধকার নেমে আসার দৃশ্য বা আবার বৎসরাধিক কাল বেহুলার কলার ভেলায় ভেসে যাওয়ার দৃশ্যটি, যেখানে ভাসমান কলার ভেলা প্রবল স্রোতে টালমাটাল, খোলা চুলে বিধ্বস্ত অবস্থায় তার ওপর ভেসে চলেছে বেহুলা। শ্বাপদ সঙ্কুল যাত্রাপথ, তার ওপর কখনো কখনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় - এরই মধ্যে দিয়েই দেখানো হচ্ছে দিন রাতের আবর্তন, সব মিলিয়ে এক অনবদ্য উপস্থাপনা।

১৯৭৭ এ অমল দত্তের নির্দেশনায় মুক্তি পায় *বেহুলা লখীন্দর* চলচ্চিত্রটি। অভিনয়ে ছিলেন মহুয়া রায় চৌধুরী, অভি ভট্টাচার্য, সুব্রতা চ্যাটার্জী, তরুণ কুমার, কালি ব্যানার্জী, সুখেন দাস প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালনায় সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতি হোম চৌধুরী, শ্যামল মিত্র এবং অনিতা মজুমদার। এই চলচ্চিত্রে মনসামঙ্গলের মূল কাহিনির বিশেষ কিছু রদ বদল না ঘটিয়ে এক বিশ্বস্ত রূপায়ণ দেখতে পাই। কাহিনিতে পাতালপুরীতে মনসার জন্মের ভিন্ন প্রেক্ষাপট, চাঁদের বাণিজ্য যাত্রার কারণ স্বরূপ ধন্বন্তরি ওঝার মৃত্যু, লক্ষিন্দরের উজানি নগরে বাণিজ্য, শতদল ও মহাবল প্রসঙ্গ, লক্ষিন্দরের ভবিষ্যৎ গণনাকারী দৈবজ্ঞ প্রসঙ্গ, চাঁদের সামনে বেহুলার নৃত্য, বেহুলা কর্তৃক সীতা সাবিত্রীর আখ্যান পড়ার প্রসঙ্গ, পদ্মার নারায়ণ সাধনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে অভিনবত্ব দেখা যায়।

প্রথিতযশা শিল্পীদের গাওয়া দশটি গান *বেহুলা লখিন্দর* সিনেমার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের বন্দনা অংশ প্রভাবিত মনসার বন্দনা গান, শিবমাহাত্ম্য বিষয়ক গান, চাঁদ বণিকের বাণিজ্য যাত্রার গান,লক্ষিন্দরের বিয়ের গান, বেহুলার অগ্নিপরীক্ষার সময় গাওয়া গান ইত্যাদি বিষয়বস্তু নিয়ে কোথাও একটি গান দীর্ঘ সময়ের বাহক হয়েছে,

কোথাও এনেছে অভিনবত্ব, কোথাও গুরুগম্ভীর পরিবেশ থেকে স্বস্তি দিতে এনেছে কৌতুক রস, কোথাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উপস্থাপনের মাধ্যম হয়েছে গান। সব মিলিয়ে মনসামঙ্গলের কাব্যধর্মীতার পরোক্ষ প্রভাব সিনেমাকে করেছে গীতিময়।

২০১০ সালে মনোজকুমারের নির্দেশনায়, নির্মলা সিনহার প্রযোজনায় *সতী বেহুলা* সিনেমাটি মুক্তি পায়। মূল চরিত্রে অভিনয় করেন হেমা মালিনী, ভাগ্যশ্রী, রাজেশ শর্মা, শ্বেতা মিশ্র, অর্পিতা মুখার্জী প্রমুখ। চাঁদ মনসার বিবাদের প্রচলিত কাহিনীকে নতুন মোড়কে পরিবেশন করা হয় এই সিনেমায়।

সতী বেহুলা চলচ্চিত্রে সাবিত্রী সত্যবানের আখ্যানের মধ্যেই বেহুলার সতীত্বের জয়গাঁথা তথা মনসাকাহিনিকে তুলে ধরা হয়েছ। অসুস্থ স্বামী সত্যবানকে প্রবোধ দিতেই বেহুলার দুঃসাধ্য সাধনের কথা বিবৃত হয়েছে সাবিত্রীর জবানিতে। সাবিত্রী সত্যবান নাম দুটিকে বাদ দিলে *সতী বেহুলায়* উপস্থাপিত এদের আখ্যান সম্পূর্ণ অপৌরাণিক, মনগড়া, আজগুবি সার্বিক ভাবে মূলের বিকৃত নির্মাণ। কাহিনির উপস্থাপনে যে অভিনবত্বগুলি এসেছে সেগুলি এই রকম - মনসার তাণ্ডব, বেহুলা লক্ষিন্দরের বিবাহপূর্ব পরিচয়, স্বর্গে বেহুলা আর উর্বশীর নৃত্য প্রতিযোগিতা, মনসার বীণ বাজাবার প্রসঙ্গে লোকবিশ্বাস আর গতানুগতিকতা, বিষহর চরিত্রের সংযোজন এবং চলচ্চিত্রে মনসার প্রাধান্য হ্রাস, দেবী চণ্ডীর মহত্ব ও তন্ত্রসাধনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইত্যাদি। এছাড়া চাঁদের বাণিজ্য তরী নিমজ্জনের কাহিনী রূপায়িত হয়নি। সিনেমার কাহিনির দুর্বল বুনট, পারম্পর্যহীনতা, অসঙ্গত ও কুরুচিকর গানের ব্যবহার, পুচ্ছানুসারিতা সব মিলিয়ে সিনেমাটি মনসামঙ্গলের বিকৃত বিনির্মাণ।

মনসাকাহিনি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় ধারা - এই ধারার চলচ্চিত্রে কোন সামাজিক বা পারিবারিক আখ্যানে দেবী মনসার সম্পূর্ণ প্রভাব তথা নিয়ন্ত্রণের ওপর আলোকপাত করা হয়। দুই বাংলায় এ হেন বহু চলচ্চিত্র পাওয়া যায়। এই ধারায় কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। জনপ্রিয় তিনটি চলচ্চিত্রের পর্যালোচনার মাধ্যমে সেই বৈশিষ্টগুলির প্রতি আলোকপাত করব। যে তিনটি চলচ্চিত্র এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা হবে, সেগুলি হল সুজিত গুহের *মনসা কন্যা* ও বিজয় ভাস্করের *নাগপঞ্চমী* এবং *মনসা আমার মা।*

১৯৯১ সালে সুজিত গুহের পরিচালনায় মুক্তি পায় বাংলা ছায়াছবি *মনসা কন্যা* । এ কাহিনি অনেকাংশে মনসামঙ্গল প্রভাবিত। চাঁদ বণিকের মতই আর এক ধনী ব্যবসায়ী যদুনাথ মল্লিকের দর্পচূর্ণ হওয়া এ কাহিনির মূল। যদুনাথের হৃদয়ে প্রকৃত মানবিকতা বোধের উদ্বোধনে ভক্তি এখানে তার অন্তঃচেতনার মুক্তির পথকে প্রশস্ত করে।

*নাগপঞ্চমী*র মণি ও *মনসা আমার মা* এর ঈশ্বরী চরিত্রে মঙ্গলকাব্যের মনসার ছায়া প্রত্যক্ষ। মনসার আশীর্বাদ ধন্য মেয়েটির পরবর্তীকালের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটে মনসার অপ্রাপ্তি, বঞ্চনা, অবহেলার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়।

১৯৯৪ এ বিজয় ভাস্করের পরিচালনায় *নাগপঞ্চমী* ছায়াছবিটি মুক্তি পায়। সিনেমায় উল্লিখিত দেবী নাগেশ্বরী মনসারই ভিন্ন নাম। অম্বিকার শিশুকন্যা দেবী নাগেশ্বরীর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে অলৌকিক ক্ষমতাবলে অপরাধীদের দমন করে। এই কাহিনির প্রভাবে একই পরিচালকের পরিচালনায় পরের বছর ১৯৯৫ এ *মণি নাগেশ্বরী* নামের একটি ওড়িয়া সিনেমা প্রকাশিত হয় যেটি পরবর্তীকালে বাংলায় ভাষান্তরিত হয়ে *মনসা আমার মা* নামে মুক্তি পায়। মনসার আশীর্বাদধন্যা ঈশ্বরী অন্যায়কারীদের শাস্তি দেন। মনসার মাহাত্ম্য প্রচারমূলক এই সিনেমাগুলিতে যে সাধারণ বৈশিষ্টগুলি চোখে পড়ে, সেগুলি হল নায়িকার প্রাধান্য, সর্পদংশন ও বিষ তোলা, তান্ত্রিক বা বৈদ্যদের বীণ বাজানো প্রসঙ্গ ইত্যাদি। মনসামঙ্গল বাঙালীর চেতনার গভীরে অবস্থিত হওয়ায় বিনির্মিত চলচ্চিত্রগুলির বেশিরভাগই বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছে। পাশাপাশি যেসব সামাজিক আখ্যানে দেবী মনসার প্রাধান্য সূচীত হয়েছে তাও প্রান্তবঙ্গীয় লোকসমাজে কিছুটা প্রভাব ফেললেও সার্বিক ভাবে গতানুগতিকতা আর একঘেয়েমির উৎপাদন করেছে, মূলত গ্রামীণ লোকসমাজই এগুলি জনপ্রিয়তার কারণ হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় - বাংলা টেলি ধারাবাহিকে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণ

মনসাসংস্কৃতির প্রতিগ্রহণের ধারায় মনসামঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে এ পর্যন্ত তিনটি বাংলা ধারাবাহিকের কথা জানা যায় -

মনসা, কালার্স বাংলা (২০১৮ -১৯)

২০১৮ সালের ২৯ এ জানুয়ারি কালার্স বাংলা চ্যানেলে শুরু হয় সুব্রত রায়ের প্রযোজনায় *মনসা* ধারাবাহিকটি। ৫১৭ টি পর্ব চলে বিস্তৃত মনসা কাহিনি। দেবীভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মনসা আখ্যান, মনসামঙ্গল কাব্যের মিশ্রণ তো ঘটেছেই তা ছাড়াও কেন্দ্রিয় চরিত্র মনসাকে প্রাধান্য দিতে বিভিন্ন পুরাণ উপপুরাণের কাহিনির সাথে মনসার কল্পিত অবস্থানকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

ক) *মনসা* ধারাবাহিকে যেখানে মনসামঙ্গল ও পুরাণে উল্লিখিত মনসাকাহিনিকে একত্রিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলি নিম্নরূপ -

মনসা ধারাবাহিকে দেখানো হয়েছে পাতালে জন্মের পর শিবের ঔরসজাত কন্যার নামকরণ করেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। মনসা মর্ত্যে এসে কঠোর তপস্যায় শিবের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং নাগলোককে রক্ষা করার জন্য অর্জন করেন জ্যোতির্ময় নাগমণি। এক্ষেত্রে মনসার জন্মকথা মনসামঙ্গল অনুসারী। কিন্তু তপস্যায় শিবকে তুষ্ট করা ও তার কাছ থেকে বরলাভ করার কাহিনি পুরাণ অনুসারী।

খ) ধারাবাহিকে উপস্থাপিত যে ঘটনাগুলি মনসামঙ্গল ও পৌরাণিক কাহিনিতে অভিনব সংযোজন এনেছে সেগুলি নিম্নরূপ -

- মনসার পুত্র শঙ্খনাগ চন্দ্রকিঙ্করের হাতে নিহত হলে ক্রুদ্ধ মনসা তাকে অভিশাপ দেয় পরবর্তী জন্মে সেও একই ভাবে পুত্রশোক পাবে। মনসার এই লড়াইকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন দেবী চণ্ডী। এভাবেই ধারাবাহিকে চাঁদ মনসা বিবাদের প্রেক্ষাপটে নতুন কাহিনি এসেছে।
- মনসাভক্ত যাত্রাবরের কাহিনি ধারাবাহিকের মৌলিক সংযোজন।
- ইন্দ্রের ষড়যন্ত্রে অপস্মারের সাহায্যে চাঁদের সপ্তডিঙা মধুকর নিমজ্জন, ইন্দ্র আর মনসার বিবাদে বার বার চাঁদ বণিকের বিপর্যস্ত হওয়ার কাহিনি মঙ্গলকাব্যের থেকে একেবারে ভিন্ন এবং সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- চাঁদের দম্ভ সুকৌশলে ভাঙতে এবং সম্মিলিত নারী শক্তির জাগরণ ঘটাতে তার গৃহে দুর্গাপূজা করার এই অভিনব কাহিনি যুক্ত করা হয়েছে ধারাবাহিকে।
- সুতরাং শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ইত্যাদি অনুযায়ী পুণ্যতীর্থ কাশীধামে মহাদেব শিবের অবস্থান প্রসঙ্গ, এবং বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে দিবোদাসের রাজ্য কাশীতে মহাদেব পার্বতীর অবস্থানের কথা পাওয়া গেলেও, শিব-পার্বতীর পুনর্মিলন উপলক্ষ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নির্দেশে বিশ্বকর্মার কাশী নির্মাণ এবং দিবোদাসের কঠোর তপস্যা, কাশীতে হরগৌরীর সংসারলীলায় মেতে ওঠার প্রসঙ্গ ধারাবাহিকের জন্য তৈরি। পুরাণ বা মঙ্গলকাব্যে এর উল্লেখ নেই।
- স্বামীর কন্যার প্রতি স্বাভাবিক রোষ মনসামঙ্গলের চণ্ডীকে করেছিল মানবিক। ধারাবাহিকে বিমাতা নয় জগতমাতা চণ্ডী অবহেলিত একটি কন্যাকে সন্তান স্নেহে আপন করেছেন। সেই সঙ্গে একজন নারী হিসাবে তার প্রতি হওয়া যাবতীয় অবহেলা, অপমানের প্রতিকারকল্পে সচেষ্টও হয়েছেন।
- দেবী চণ্ডীর নির্দেশে জরৎকারুর মন জয় করার জন্য ব্রতচারিণী হয়ে তার আশ্রমে অবস্থান, তার শিষ্যদের সেবা করা, ইন্দ্রের ষড়যন্ত্রকে হারিয়ে দুর্বাসা ও তার শিষ্যদের পরিতুষ্ট করা, বিবাহের পূর্বে জরৎকারু কর্তৃক মনসার অগ্নিপরীক্ষা, বিবাহের পর জটাসুর ছলনায় মনসাকে স্পর্শ করলে শ্বেত পর্বতে মনসাকে পাঠানো, মনসার প্রাণসংশয়, শিবের ভর্ৎসনায় জরতকারুর অনুশোচনা, মনসাকে উদ্ধার, নাগলোকে মনসা ও জরৎকারুর বরণ উৎসব, শিবালয়ে মনসা ও জরৎকারুর শিব-চণ্ডী আরাধনা - এই সকল ঘটনাক্রম ধারাবাহিকের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। জাতিগত ভেদবুদ্ধি ও উগ্র পুরুষতন্ত্র কীভাবে একটি সাধারণ মেয়ের সাধারণ স্বপ্নগুলির সামনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, কীভাবে প্রতি পদে পদে তাকে অপমান বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়, কীভাবে সে ভাগ্যকে জয় করার জন্য দৃঢ়চেতা হয়ে ওঠে, মনসার বিবাহ প্রসঙ্গে ধারাবাহিকের সংযোজিত অংশে সেই আবহমান সত্যই উঠে আসে।
- ধারাবাহিকে মনসা সাতটি নাগ সন্তান জন্ম দেবার পর মহাদেবের নির্দেশে কশ্যপ মুনি দারুক বনে পুত্রকামের্থী যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞের ফলে আস্তিকের জন্ম হয়।

- মনসা ধারাবাহিকে মনসাকে কুচক্রীরূপে তুলে ধরা হয়নি। নাগজাতির মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্বার্থপরতা, তক্ষকের সাথের মিলিত হয়ে ইন্দ্রের ষড়যন্ত্র মর্ত্যবাসীর দুর্গতির কারণ হয়েছিল। মনসা মর্ত্যবাসীর দুর্ভোগ দূর করতে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে, বারবার আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে মর্ত্যলোকের কল্যাণকর্মে নিযুক্ত থেকেছে।

গ) মনসা ধারাবাহিকে বেশ কিছু পৌরাণিক কাহিনিতে মনসার যোগসূত্র স্থাপন করে নতুন রূপে তুলে ধরা হয়েছে -

- মনসার সক্রিয় মধ্যস্থতায় বালখিল্যের মৃত্যুযজ্ঞ থেকে উঠে আসা দুটি ডিম থেকেই বিনতার গর্ভে জন্ম নেয় অরুণ আর গরুড়।
- ইন্দ্রদেব মহাদেবের সঙ্গে ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধের সময় ষড়যন্ত্র করে মনসাকে যুদ্ধস্থলে পাঠান। বিদ্যুন্মালির অস্ত্রের আঘাতে হতচেতন মনসাকে নিয়ে যুদ্ধ প্রাঙ্গন ত্যাগ করেন মহাদেব। কন্যার প্রাণসংশয় উপস্থিত হলে তিনি শোকে ক্রোধে তাণ্ডবে মেতে ওঠেন। অতঃপর মহামায়া স্বামীকে শান্ত করেন এবং শিব কর্তৃক ত্রিপুরাসুর বধ সম্পন্ন হয়।
- মহামুনি কশ্যপের কাছে জরৎকারু বিবাহের বিষয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বের কথা ব্যক্ত করলে মুনি তাকে আশ্বস্ত করেন। নারায়ণ কর্তৃক বলিরাজার পাতাল প্রবেশের বৃত্তান্ত শুনিয়ে বোঝান স্বয়ং ভগবান ত্রিলোক রক্ষার্থে যদি ছলনা করতে পারেন, তাহলে কেবল বংশ রক্ষার্থে বিবাহে কোনো দোষ নেই।
- বলিরাজার স্বর্গদখল, মনসার সন্তানদের জীবন সংশয়ের প্রেক্ষাপটে সমুদ্র মন্থনের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে।
- গরুড়ের অমৃত আহরণ বৃত্তান্তের সাথে মনসাকে যুক্ত করা হয়েছে।
- চণ্ডীর নির্দেশে মনসার বিবাহ উৎসবে শারীরিক বল প্রয়োগে নাগেদের প্রবেশ আটকাতে বীরভদ্রকে ব্যবহার দেখানো হয়েছে।
- জটাসুর জরৎকারুর ছদ্মবেশে মনসাকে অপবিত্র করতে উদ্যত হলে মহাদেব কর্তৃক জটাসুরের পাতাল প্রবেশের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে।

- দেবী অনসূয়া, পুরাণ মতে যিনি চন্দ্রদেবের মা, তার প্রতি চন্দ্রদেবের অনুরাগ ও প্রেম প্রস্তাব একেবারে নতুন কথা, যা ধারাবাহিকে দেখা গেল। চণ্ডী কর্তৃক কর্ণাট অসুর বধের অভিনব কাহিনিও কৌশলে জুড়ে দেওয়া হয়েছে । আর সমগ্র ঘটনায় মনসার প্রভাব দেখিয়ে জগত কল্যাণে তার মহতী ভূমিকাকে তুলে ধরতেই এ হেন নবনির্মিত কাহিনির অবতারণা।
- দেবী চণ্ডীর উগ্রকালী রূপে অন্ধককে সংহার, মনসাপুত্র খরিস নাগের সঙ্গে অন্ধকের সন্ধি, এই ঘটনাগুলি ধারাবাহিকের অভিনব সংযোজন।
- মনসা দেবী চণ্ডীর স্তুতি করে তার শাকম্ভরী রূপের জাগরণ ঘটান এবং মর্ত্যবাসীকে রক্ষা করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।
- দেবী চণ্ডী কর্তৃক শুম্ভ নিশুম্ভ বধের কাহিনি পুরাণ স্বীকৃত। কিন্তু মনসার মধ্যস্থতা তথা শক্তির নানা রূপের জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার কাহিনি ধারাবাহিকের সংযোজন।
- অপস্মার দমনের পৌরাণিক কাহিনিতে মনসামঙ্গলের চাঁদ ও মনসাকে যুক্ত করে কাহিনিকে অভিনব রূপে গড়ে তোলা হয়েছে।
- ধারাবাহিকের প্রয়োজনে নতুন নতুন গান তৈরি হয়েছে। নাগমণির ব্যবহার, মনসা জরৎকারুর বিবাহে লোকাচার ইত্যাদি সীমিত ক্ষেত্রে লোকাচার ও লোকসংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নানা সূত্র জুড়ে নির্মিত ধারাবাহিকের কাহিনির তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে যুক্ত হয়েছে, জগত সংসারের নারীদের অবহেলা, তাচ্ছিল্য, নির্যাতন, পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আত্মবিশ্বাসী নারী শক্তির জাগরণ তথা জয়ের রূপরেখা।

বেহুলা, স্টার জলসা (২০১০-২০১১)

স্টার জলসা চ্যানেলে মনসামঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে *বেহুলা* ধারাবাহিকটিতে সৃজিত রায়ের পরিচালনায় শ্রীকান্ত মেহতা ও মহেন্দ্র সোনির প্রযোজনায় শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেন পায়েল দে, রূপাঞ্জনা মিত্র, চান্দ্রেয়ী ঘোষ, জুন মালিয়া, অর্ক মজুমদার, কুশল চক্রবর্তী প্রমুখ। মনসামঙ্গলের মূল কাহিনি এই ধারাবাহিকে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে।

মূল কাহিনিতে ঊষার নিয়ন্ত্রণ, মায়া কুটিরে চাঁদ সনকার মিলন, বেদিনী বেশী নেতার দ্বারা সনকার ভাগ্য গণনা, মনসার অন্তর্দ্বন্দ্ব, মিথ্যাচার, একই দিনে ছদ্মবেশী মনসার হাতে বেহুলা লক্ষিন্দরের জন্ম, বাল্যে বেহুলা লক্ষিন্দরের সাক্ষাৎ, জাতিস্মর বেহুলা, মনসা পূজা করায় বণিক কুল থেকে সায় বণিকের নির্বাসন, বেহুলার বিয়ে ভাঙতে মনসার চক্রান্ত ইত্যাদি প্রসঙ্গে কাহিনিতে অভিনবত্ব আনা হয়েছে। এছাড়া সামাজিক কুসংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে ধারাবাহিকের সংযোজিত কাহিনি অবলম্বনে। পরিবর্তিত বা সিরিয়ালের জন্য লেখা সম্পূর্ণ মৌলিক ঘটনাংশ কোথাও বিকৃত মনে হয়নি, বরং মূল কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখায় সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। সেই সঙ্গে উন্নত গ্রাফিক্স এর ব্যবহার কলা কুশলীদের দক্ষ উপস্থাপনা সব মিলিয়ে 'বেহুলা' ধারাবাহিককে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

ভূমিকন্যা, স্টার জলসা (২০১৮ -১৯)

রূপক সাহার *তরিতা পুরাণ* উপন্যাস অবলম্বনে অরিন্দম শীলের নির্মিত স্টার জলসার *ভূমিকন্যা* ধারাবাহিক অভিনয় কেন্দ্রিক মনসাকথার অন্যতম ব্যতিক্রমী বিনির্মাণ।

একুশ শতকে লেখা *তরিতা পুরাণ* উপন্যাসে মনসার দৈবী মহিমাকে ছাপিয়ে গেছে তরিতার মানব মহিমা। উপন্যাসে মনসামঙ্গল কাব্য-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে। মঙ্গলকাব্যের দেব দেবী চরিত্রের হয়েছে মানবায়ন।

উপন্যাসে তরিতা লড়েছে চাঁদের নারী বিদ্বেষী উগ্র পুরুষকারের বিরুদ্ধে। ব্যাক্তিগত সংঘাতই এখানে মুখ্য। কিন্তু দূরদর্শনের তরিতার সঙ্গে চন্দ্রভানুর সংঘাতের প্রধান কারণ সুন্দরগড়ে চন্দ্রভানুর অনাচার সামাজিক নিষ্পেষণ শোষণ এর বিরুদ্ধে লড়াই। নারী তথা সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কটের বিরুদ্ধে, তাদের সঙ্গে ঘটতে থাকা নিরন্তর অপশাসনের বিরুদ্ধে তরিতার লড়াই তার সাথে মনসার চরিত্রের পার্থক্য সূচিত করে।

টি. আর. পি.র খাতিরেই হোক, অথবা তরিতাকে আরও বেশি মানবিক করার জন্যই হোক, *ভূমিকন্যায়* অঙ্কুশ তরিতার প্রেম ও বিয়ের ঘটনা দেখানো হয়েছে। দেবী হোক বা নারী এই অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা সর্বত্র সমান। মনসার বৈবাহিক জীবনের অপ্রাপ্তিকে পূর্ণতা দিয়েছেন, তরিতা

অঙ্কুশের প্রেমের জয়ের মধ্যে দিয়ে। এছাড়া অন্ধকারের প্রতীকী চাঁদের মৃত্যু দেখানোয় মনসামঙ্গলের প্রতীকী কাহিনিতে অভিনবত্ব এসেছে।

মনসা পূজার সঙ্গে যুক্ত লোকক্রীড়া নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা ধারাবাহিকের কাহিনিতে যুক্ত হয়েছে। অঙ্কুশ তরিতার বিয়েতে নানা লোকাচার দৃশ্যায়িত হয়েছে। সর্পবিশারদ তরিতার দুর্গম মনসা দ্বীপ থেকে প্রতিমা গড়ার জন্য মাটি আনার মধ্যেও রয়েছে লোকসংস্কৃতির প্রভাব। *তরিতাপুরাণ* উপন্যাসে হারাধন পালাকারের গাওয়া মনসা বন্দনা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল থেকে নেওয়া । এভাবেই ধারাবাহিকের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে মনসা বা শিবের স্তুতিমূলক সঙ্গীত। কখনও বা মনসামঙ্গল বা পাঁচালী থেকে প্রাপ্ত কথায় হাগু নতুন করে সুরের প্রয়োগ। একই সঙ্গে একালের প্রেক্ষিতে ধারাবাহিকে ব্যবহৃত হয়েছে কিশোরকুমারের জনপ্রিয় আধুনিক গান ‘সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা’র মত গান অঙ্কুশ তরিতার প্রেমের প্রেক্ষাপটে।

একুশ শতকের *তরিতা পুরাণ* সর্বপ্রথম মনসার মানবী রূপের প্রকাশ। অলৌকিকতা নয়, শিক্ষার আলোয় তার আত্মপ্রতিষ্ঠা। *ভূমিকন্যা* র তরিতা আরও একধাপ এগিয়ে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নেয়। ‘মনসামঙ্গল’ – *তরিতা পুরাণ* - *ভূমিকন্যা* তিনটি ক্রমিক পর্যায় সমাজে নারীর অবস্থার বিবর্তন তথা উত্তরণের ধারার সমুজ্জ্বল প্রকাশ। আবহমান কাল ধরে চরম প্রতিকূলতা পেরিয়ে জীবন যুদ্ধে জয়ী শত সহস্র নারীর মধ্যে প্রতিদিন পূর্ণতা পাচ্ছে মনসা থেকে তরিতার এই ক্রমিক উত্তরণ।

উপসংহার - বর্তমান গবেষণায় পশ্চিমবাংলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মনসাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং নির্বাচিত ক্ষেত্রে তার প্রতিগ্রহণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার নিরিখে দেখা গেছে, ঘটে, সিজ গাছে, মাটির ঢিবিতে, প্রতিমায় যেভাবেই পূজা হোক না কেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মনসা পূজার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাপের উপদ্রব ও ক্ষয়ক্ষতির কাহিনি। আদিবাসী সম্প্রদায়ের সরল অনাড়ম্বর মনসা পূজার বিপরীতে জাঁকজমকপূর্ণ পূজা উৎসব, কোথাও মনসা আর দেবী দুর্গার মিলিত পূজা, কোথাও কমলা আর বিমলা দুই বোনরূপে দেবীর স্বতন্ত্র অবস্থান, আবার কেউটে প্রজাতির জীবিত সাপের পূজায় কালনাগিনীর মিথ, বেহুলা পূজা, মনসা পূজায় উনুন ও রান্না সামগ্রীর পূজা, পূজা উপলক্ষে ভেলা ভাসানো উৎসব, অথবা ছদ্মবিয়ের আয়োজন, কোথাও বলি নিষিদ্ধ,

কোথাও একদিনে অন্ততঃ পঁচিশ হাজার বলির প্রথার প্রচলন, কোথাও মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক সমন্বয়, কোথাও ধর্মীয় বিরোধিতা থেকে জাতিভেদের চরম প্রকাশ - এরকম বহু বৈচিত্র্য নিয়ে গ্রামবাংলার লোকমনন, সংস্কার, বিশ্বাস আচরণে মনসার গভীর ও ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রয়ানি, মনসাযাত্রা, কবি ঝাঁপান ও পটুয়া শিল্পে মনসামঙ্গল কেন্দ্রিক উপস্থাপনমূলক লোকসংস্কৃতির ধারাগুলি প্রবহমান । পাশাপাশি অভিকরণমূলক মার্জিত সংস্কৃতিতে মনসামঙ্গলের অভিনয় কেন্দ্রিক (নাটক, চলচ্চিত্র, টেলি- ধারাবাহিক) বিনির্মাণের বিশ্লেষণে দেখা যায়, নাটকগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তা দিয়েছে, সমাজের নগ্নতা, বৈষম্য, ভেদাভেদকে তুলে ধরেছে, কোথাও বা নাট্যকারের বিশেষ জীবনবোধের প্রকাশ মাধ্যম হয়েছে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কাহিনীর বিবর্তন, উপস্থাপন রীতির বিশিষ্টতা যেমন অত্যন্ত জনপ্রিয়তার কারণ হয়েছে, তেমনি বিকৃত বিনির্মাণ অনাদৃত হয়েছে , আবার পুচ্ছানুসারিতার দোষও বেশ কিছু ক্ষেত্রে চোখে পড়ে। মনসামঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে দূরদর্শনের জন্য তৈরি ধারাবাহিকগুলির প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বতন্ত্র অবস্থানে জনপ্রিয় হয়েছে। তবে কাহিনিকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে একেবারে নতুন রূপে উপস্থাপন অপেক্ষা তুলনামূলক ভাবে পৌরাণিক আবহে মনসা, বেহুলার আখ্যান অনেক বেশি দর্শকদের মন জয় করেছে। সব মিলিয়ে একুশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বগ্রাসী প্রভাবের মধ্যেও বাংলার লোকসংস্কৃতি ও মার্জিত সংস্কৃতি দুটি ক্ষেত্রেই মনসামঙ্গলের সুগভীর প্রভাব ও দৃঢ় অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

১) অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সওদাগরের নৌকা, সম্পাদনা কৌশিক রায় চৌধুরী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৪।

২) অঞ্জন সেন ও শেখ মকবুল ইসলাম, সর্প সংস্কৃতি ও মনসা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২।

৩) অশোক রায় প্রধান, উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে বিষহরি থেকে মনসা, সুচেতনা, ২০১৮।

৪) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, মুদ্রণ ২০০৮-২০০৯।

৫) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড প্রথম পর্ব, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, মুদ্রণ ২০০৬-২০০৭।

৬) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।

৭) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৫।

৮) উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উজ্জ্বল নাটক, ধানসিঁড়ি, ২০১৮।

৯) কাশীরাম দাস, মহাভারত, প্রকাশক পূর্ণচন্দ্র শীল, অক্ষয় শীল, ১৯২৫- ১৯২৬।

১০) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, অক্ষয় কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, ১৯৭৭।

১১) জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, রত্নাবলী, ২০১০।

১২) তারাশঙ্কর মুখার্জী, মনসামঙ্গল, Digital Library of India, ১৯৫৯।

১৩) দ্বিজ বংশীদাস, পদ্মাপুরাণ, অক্ষয় লাইব্রেরী, ২০১৮।

১৪) নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।

১৫) নির্মল দাস, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৫।

১৬) পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়, চাঁদ সদাগর(বেহুলা), পাল ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৩০।

১৭) বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

১৮) বিপ্রদাস পিপলাই, মনসাবিজয়, মিহির চৌধুরী কামিল্যা সম্পাদিত, মণ্ডল বুক হাউজ, ২০১৬।

১৯) বিপ্রদাস পিপলাই, মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, রত্নাবলী, ২০০২।

২০) মন্মথ রায়, চাঁদ সদাগর, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯৩০।

২১) মহামুনি মার্কণ্ডেয়, কালিকাপুরাণ, শ্রী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদিত, শ্রী দয়ালচাঁদ বাবুই প্রকাশিত, কলকাতা, ১৮৭৪ - ১৮৭৫।

২২) মহর্ষি বেদব্যাস, গরুড়পুরাণ, পূর্বখণ্ড, শ্রী রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার অনুবাদিত, শ্রী গোপালচন্দ্র ঘোষ মুদ্রিত, ১৮৮২।

২৩) মহর্ষি বেদব্যাস, দেবীভাগবতম্, সম্পাদনা পঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, ২০১১।

২৪) মহর্ষি বেদব্যাস, বামনপুরাণম, শ্রী মহেশচন্দ্র পাল সংকলিত প্রকাশিত, ১৯৫০।

২৫) মহর্ষি বেদব্যাস, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রী সুবোধকুমার চক্রবর্তী, এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬০।

২৬) মহর্ষি বেদব্যাস, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, সম্পাদনা সুবোধচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটীর, ২০১৮।

২৭) মহর্ষি বেদব্যাস, বৃহৎ শিব পুরাণ, কালি প্রসন্ন বিদ্যারত্ন অনুদিত, শ্রী গনেশ চন্দ্র ঘোষ প্রকাশিত, ১৮৪৭।

২৮) মহর্ষি বেদব্যাস, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, শ্রী সুবোধকুমার চক্রবর্তী, এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬১।

২৯) মহর্ষি বেদব্যাস, লিঙ্গপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন অনুবাদিত, ১৮৯০-১৮৯১।

৩০) মহর্ষি বেদব্যাস, স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন অনুদিত, কালীকৃষ্ণ মণ্ডল প্রকাশিত, শ্রী অমৃতলাল মান্না ফ্রেন্ড অ্যান্ড কোম্পানি মুদ্রিত, ১৮৭৯-১৮৮০।

৩১) রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শিবায়ন, শ্রী যোগীলাল হালদার সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭।

৩২) রূপক সাহা, তরিতা পুরাণ, দীপ প্রকাশন, ২০১৮।

৩৩) শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য, শ্রীশ্রীমনসা পূজা পদ্ধতি, বেনীমাধবশীল'স লাইব্রেরী, ২০১৮।

৩৪) শেখর দেবরায় , মনসাকথা, নব চন্দনা প্রকাশনী, ২০১২।

৩৫) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০১।

৩৬) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৩।

৩৭) হরনাথ বসু, বেহুলা, Digital Library of India, ২০১০।

সহায়ক পত্র পত্রিকা

১) ঐকিক পত্রিকা, মনসামঙ্গল কাব্যসংখ্যা, সম্পাদক মিঠুন দত্ত, ২০১৫।

২) কোরক সাহিত্য পত্রিকা, সম্পাদক তাপস ভৌমিক মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্য চর্চা, ২০১৬।

৩) কৌলাল, সর্পদেবী মনসা, সম্পাদক স্বপনকুমার ঠাকুর, ২০১৯-২০২০।

৪) সুচেতনা, বিষহরী মনসা সংখ্যা, সম্পাদক গৌতম মণ্ডল, ২০১৭।

ইংরেজি গ্রন্থ

১) Pradyut Kumar Maity, Historical Studies In The Cult Of Goddess Manasa, Puthi Pustak, 2001 ।

ইংরেজি গবেষণা পত্র

১) Bhaty Rupa, 2017, http://Indiafacts. Org, Astronomical Association Of Nataraja's Dance With Apasmara And Agastya ।